

પ્રથમ વર્ષ ॥ પ્રથમ અંક



গল্পের তরী



ই – ম্যাগাজিন

প্রথম বর্ষ (২০২২)

সম্পাদক

সৌপর্ণ গাঙ্গুলী

উপদেষ্টামণ্ডলী

পৃথ্বীরাজ চৌধুরি

শুভদীপ সাহা

প্রচ্ছদ

সুমন দাস

গ্রন্থস্বত্ব

টিম গল্পের তরী

আমাদের নিয়মিত গল্প শুনতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল 'গল্পের তরী' কে ভিসিট করুন।

অথবা নিচের লিঙ্কটি কপি করে পেস্ট করুন ইউটিউব বা আপনার অন্য কোন পছন্দের ব্রাউজারে -

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

সম্পাদকীয় কলম

নমস্কার বন্ধুরা, আমি সৌপর্ণ, আর আপনারা হলেন গল্পের তরীর যাত্রী।

আপনাদের জন্য এই প্রথমবার আমরা নিয়ে এসেছি **গল্পের তরী ই-ম্যাগাজিন**। যেখানে আপনারা পাবেন বিভিন্ন ধারার গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও আরও অনেক কিছু।

আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা, তাই ভুল ত্রুটি থাকবে কিছু নিশ্চয়ই। তা বলে মার্জনা করবেন না কিন্তু, যেখানে যা মনে হয়, বিস্তারিত লিখে জানাতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ-এর ইনবক্সে, অথবা মেইলও করতে পারেন।

সম্পাদকের কলমে প্রথমবার লিখতে গিয়ে আমিও একটু খেই হারিয়ে ফেলছি, তবে মনে পড়ছে, আমাদের দলের সমস্ত সদস্যদের কথা, যারা অনর্গল উৎসাহ জুগিয়েছেন এই কর্মকাণ্ডে সফল করার উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে শুভদীপ এবং পৃথ্বীরাজ এনাদের দুজনের নাম ভীষণ ভাবে করতে হয়, এঁরা গল্পের তরী ই-ম্যাগাজিনের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অবিরাম পরামর্শ দিয়েছেন।

আমাদের দলের কেউ লিখেছেন, কেউ ছবি আঁকেছেন, কেউ ফটো পাঠিয়েছেন, আবার কেউ পিছনে থেকে সাহায্য করেছেন।

সকলের প্রচেষ্টায় কতটা সফল হল ‘গল্পের তরী ই-ম্যাগাজিন’, সেটা আপনারা অর্থাৎ আমাদের শ্রোতা থুড়ি পাঠকরাই বলতে পারবেন।

তাহলে উঠুক তরীর পাল, শুরু হোক পড়া.....

সৌপর্ণ গাঙ্গুলী,

সম্পাদক, গল্পের তরী ই-ম্যাগাজিন।।

সূচীপত্র

উপন্যাস

ব্রাবন দ্বীপের রহস্য পৃষ্ঠা নং - ১১
সোমতীর্থ গাঙ্গুলি

প্রথম আলো পৃষ্ঠা নং - ৩৪
শুভরাজ দত্ত

ছোট গল্প

আক্ষেপ পৃষ্ঠা নং - ০২
গীতকার

এক আকাশ সমান সুখ পৃষ্ঠা নং - ০৮
গীতকার

See No Evil – পৃষ্ঠা নং - ০৩
Speak No Evil – Hear No Evil
পৃথ্বীরাজ চৌধুরি

বিসর্জন পৃষ্ঠা নং - ০৭
অবন্তিকা বাগচী

কবিতা

শক্তিপদ পৃষ্ঠা নং - ০১
দিপায়ন মল্লিক

কেমন তুমি পৃষ্ঠা নং - ১০
দিপায়ন মল্লিক

জীবন গণিত পৃষ্ঠা নং - ০৬
দেশব্রত বিশ্বাস

শুধু ভালোবাসা পৃষ্ঠা নং - ০৯
শ্রীমন্ত ভদ্র

ক্ষয়াটে জীবন পৃষ্ঠা নং - ৩৪
সৌপর্ণ গাঙ্গুলী

গল্পের তরী অরিজিনালস

কেসটা এখনও পেভিং পৃষ্ঠা নং - ২৬
টিম গল্পের তরী

অন্য আকর্ষণ

বই এর রিভিউ পৃষ্ঠা নং - ২৪
সৌপর্ণ গাঙ্গুলী

সিনেমা হলেও সত্যি পৃষ্ঠা নং - ২৫
সুলগা ব্যানার্জী

আঁকা এবং ছবি

আঁকা পৃষ্ঠা নং - ০৫, ০৬, ১৩, ২২
বিবেকজিত ঘোষ

ছবি
শুভদীপ সাহা পৃষ্ঠা নং - ০২, ১০
সৌভিক সেনগুপ্ত পৃষ্ঠা নং - ০৯, ৩৩

শক্তিপদ

~ দিপায়ন মল্লিক

শক্তিপদর শক্তি বেজায়, বুদ্ধিতে পায় অঙ্কা।
খাওয়ার ফিকির খোঁজে, কেবল পেলে মওকা।
বিশ্বজোড়া, নিখিল সারা, যেইখানেতেই ঘুরি,
ঘাড় ঘোরে না চৌদিকেতে, এন্ত বড় ভুঁড়ি!!

নারীর খবর কেইবা রাখে, একটি ছিল তারও..
ফুলশয্যার রাত পোহাতেই, "বাঁচাও" বলে পালালো
এখন কেবল রাত্রি জাগে, একটি পাশে বুড়ো
সে ঘুমোলে, আরেক পাশে, ভুরি ঘুমায় তারও।

সকাল হলেই নাইতে যাবে, গাইতে গাইতে মনে..
জলই জানে গা ভিজাতে কতটা জল লাগে।
স্নানটি সেরে, গা মুছে, ফিরতে ফিরতে পথে..
পেটে চড়ে জিলাপি কচুরি ফেরে তার সাথে।

একটু বেলা হলেই ছোট, আদ্যোপান্ত দেখে..
কোন আনাজ কতই ছিল কতই গিয়ে ঠেকে।
মাংস ছিল, একটু প্রিয় তাই তো বোধহয় সেবার;
আন্তখাসি বুলছে, দেখে কামড়ে নেওয়ার জোগাড়।

সংঘম তার রক্তে নেই, অসংঘমী বলে,
পরশু বলে, লুপ্তি নাকি টাইট হয় কোমরে!
আবার বলে, এখন আর খাই না বেশি মোটে,
রাতে খান তিরিশ রুটি সাথে যখন যা জোটে।

ফলের উপর আছি রে ভাই, শরীর বড়ই উইক,
খাবার পরও থিদে কেন পায়, বলতে পারিস কুইক?
আমি বলি, আসছে যে ষাট, একটু তবে লাগাম টান..
নইলে পড়ে খাটটি ধরার লোক পাওয়া কঠিন বড়।

একটু হেসেই শক্তি বলে,
মুক্তি আমার কোথায় ওরে..
খাবার জন্য আছি বেঁচে,
ওসব, মরার পরে দেখবো ভেবে।।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

আক্ষেপ

~ গীতকার

বসুধা আজ মুক্ত, সে আজ প্রথমবার পা রাখলো তার স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে আজ সে বছর একুশের ছিপছিপে তরী নয়, আজ সে বছর তিরিশের ডিভোর্সি রমণী। শরীরে কিছু জায়গায় মেদ জমেছিল, মুখের লাবণ্য সংসারের চাপে কিছুটা হলেও হারিয়েছিল। তাই হয়তো তার স্বামী রঞ্জনের ভালবাসাটা ফিকে হয়ে গেছিলো, আর তার কনসিভ না করতে পারার অভিযোগ দিয়ে তার থেকে দূরে সরে গেছিলো।

কিন্তু দুবছর পরে অনেক পরিশ্রমের পর আবার নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে আগের মত করে। পরনে কালো পারের ছাই রঙের শাড়ী, সাদা ব্লাউজ, চোখে ঘন কাজল, হাতে সিলভার কালারের দুটো মোটা চুরি, কানে ছোট দুটো মুক্ত, ঠোঁটে নুড কালার লিপস্টিক। কাঁধে স্লিং ব্যাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রেখে অতীতের কথা ভেবেই চোখে জল আসল বসুধার। পড়াশোনাতে খুব যে ভালো ছিল বসুধা এমন নয়, কিন্তু খুব সুন্দর আঁকতে পারতো সে। তাই বিএফএ (ব্যাচেলর অফ ফাইন আর্ট) কোনমতে শেষ করতে পেরেছিল। তাদের বাড়ির মেয়েদের তাত্ত্বিক বিয়ে দেওয়া হতো তাই তারটাও দেরি করতে চায়নি তার পিতা প্রমতেশ বাবু আর তার মা বসুন্ধরা দেবী। এই রাশভারী গম্ভীর স্বভাবের মানুষগুলোর বিপরীতে কিছু বলার সাহস হয়নি মৃদুভাষী ও ভীতু বসুধার। তাই বাবা মায়ের পছন্দের সু-পাত্র সরকারি চাকরিজীবী রঞ্জনের সাথে বিয়েও হয়ে যায়। প্রথমেই তার স্বামী তার পরবর্তী পড়াশুনোর বিষয়টি নাকচ করে বলে "এত সুন্দরী বউ! বাইরে ছাড়লে যদি আমায় ভুলে যাও... তার থেকে ভালো তোমার ছোট সংসারটা গুছিয়ে নাও।" তাই বাধ্য হয়ে আর রঞ্জনকে খুশি রাখতে সে সংসারেই মন দেয়। প্রথম পাঁচ - ছয় বছর সে মোটের ওপর সুখীই ছিল। তারপর বাচ্চা নেওয়ার চেষ্টা করতেই ডাক্তার বলে দেন বসুধার অনেক কম্প্লিকেশন আছে, বাচ্চা নিতে গেলে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা করাতে হবে, তারপরও কোনো ঠিক নেই।

ব্যাস.... বদলে গেলো সব কিছু। মনের ভারের সাথে বেড়ে গেলো দেহের ভারও। সে ভেবেছিল রঞ্জন আর তার মা বাবা তাকে অন্তত সাহস দেবে, পাশে দাঁড়াবে... কিন্তু না! বাবা মা বলল "মানিয়ে নে, সব ঠিক হয়ে যাবে।" রঞ্জন ব্যস্ত হয়ে পড়ল... বসুধা ভালো অফিসে চাপ হয়তো খুব। পরে বুঝলো ওইসব কিছুনা সে ব্যস্ত অফিসে নতুন আসা টিনার সাথে। রঞ্জনকে এই নিয়ে বলতে সে তার মা না হতে পারার ব্যাপারটা নিয়ে কথা শুনিয়ে দিলো। বাবা মাকে এবার ভালো পাশে পাবে কিন্তু আবারও তাদের একই উত্তর... "মানিয়ে নে"।

এইভাবে মানিয়েই কেটে গেলো আরও দুবছর... রঞ্জন কথাও বলে না ঠিক করে, টিনাকে নিয়ে বাড়িতেই চলে আসে। তাই বসুধা তার পুরনো কলেজ লাইফের বন্ধু তিয়াশার সাথে যোগাযোগ করে একটা চাকরির জন্য। অতীত থেকে বেরিয়ে আসলো বসুধা, চোখের জলটা মুছে নিলো।



ছবি - শুভদীপ সাহা

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

তিয়াসার হাত ধরে বললো, "তুই না থাকলে আমি হয়তো হারিয়েই যেতাম। ভাগ্যিস তুই সেদিন তোর আর্ট গ্যালারিতে আমার আগের আঁকা ছবির এক্সজিবিশনের ব্যবস্থাটা করে দিয়েছিলি। তাই দুবছরে তোদের সাপোর্টে আজ আমি ওই বেইমান লোকটার থেকে মুক্ত, তোরাই আমার পরিবার। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে পার করে দেওয়াই যদি বাবা মার কাজ হয় তাহলে বলবো জন্ম দেওয়ার দরকার নেই। তাই বাবা মায়ের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার আক্ষেপটাও নেই আমার। আজ আমায় সবাই এক ডাকে চেনে। যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়তে চেয়েছিলাম... সেখানে আজ আমি গেস্ট। আমার আক্ষেপ হয়েছিল যখন ডক্টর বললো আমি কনসিভ করতে পারবো না! জানিস? কিন্তু এই দুবছরে সেটা আর হয়নি। কারণ আমার স্বপ্নটা শুধু সংসার আর বাচ্চা ছিলনা। আমার স্বপ্নটা অনেক বড় ছিল। তবে আক্ষেপ হয় যদি আমি সেই একুশ বছর বয়সেই বাবা মায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারতাম তাহলে আমার জীবনের এতগুলো মূল্যবান বছর ওই নরকটাতে নষ্ট হতো না।

তিয়াসা বললো, "অনেক হয়েছে ভেতরে চল। সবাই অপেক্ষা করছে তো! আর সাথে আমার প্রিয় দাদাটাও। ডিভোর্স তো হয়েই গেলো এবার তো ভাব আমার দাদাভাইয়ের কথা... সেই তেরো বছর ধরে তোকে ভালোবাসে।"

বসুধা উত্তর দিলো না। মনে মনে ভাবলো যে, ভালোবাসার জন্য কোনো সিঁদুর বা সই-এর দরকার হয় না। একবার তো সে করে দেখেছিল এইসব, কিন্তু ভালোবাসাটাই হয়নি শুধু ছিল দায়িত্ব আর মানিয়ে নেওয়া। এবার না হয় সে ভালোবাসবে কোনো বাঁধন ছাড়াই কারণ এই বাঁধন তাকে তেরো বছরে কোনো দিনও বাঁধতে চায়নি... সে কলেজে পড়াকালীন হোক বা নামকরা আর্টিস্ট হওয়ার পর হোক। তিয়াস তাকে সব সময় বলেছে সে পাখি... তাকে বন্দী মানায় না।।

See No Evil - Speak No Evil - Hear No Evil

~ পৃথ্বীরাজ চৌধুরি

See No Evil

পেপারব্যাকটা থেকে আমার চোখটা মাঝে মাঝেই সামনের জানলায় বসে থাকা ছেলেটির দিকে চলে যাচ্ছে। অনুমান করছি, প্রায় আমার ছেলেরই সমবয়সী। বয়স অন্তত বছর কুড়ি তো হবেই।

দেখলাম, বাবার হাতটা ধরে যখন এসে বসলো, তখন থেকে আমার দিকে মাত্র একবারের জন্যে তাকালেও কোনোও কথা বলেনি।

সমানে জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর আপন মনে হাসছে।

অকারণে যারা আপনমনে হাসে, তাদের প্রতি আমি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হলেও, অস্বীকার করবো না একটু একটু ভয়ও পাই।

ছেলেটি তার বাবার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই বলে উঠছে "বাবা দেখ, গাছগুলো কেমন পেছনের দিকে ছুটে ছুটে যাচ্ছে!"

শুনে উনি শুধু হাসছেন, আর ঘাড় নাড়ছেন।

এদিকে আমার পাশে বসে থাকা কমবয়সী দম্পতির অল্পস্বল্প ফিস-ফাস আমার কানে আসছে। এইরকম দেখলে যা হয় আর কি?

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্লেবের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

হঠাৎ ছেলেটি চোঁচিয়ে ওঠে, "বাবা মেঘগুলোকে দেখেছো? আমাদের সঙ্গে ওরাও কেমন সমানে দৌড়ছে?"

সেটা শুনেও দেখলাম, ভদ্রলোক ওকে হাসিমুখে উৎসাহিত করে চলেছেন। আমি আবার আমার হাতের পেপারব্যাকটায় চোখ ফেরালাম। ছেলেটির সমবয়সীরা কি কখনও চলন্ত গাছ, চলন্ত মেঘ নিয়ে এইরকম ভাবে উচ্ছসিত হতো? দূরে রাস্তায় চলতে থাকা বাস, লরি, গাড়ি দেখে এত খুশি হতো?

যাইহোক, সেই দম্পতি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই বসলো, "আচ্ছা, ও কি বরাবরই এইরকমই? ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছেন বুঝি?"

ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে বিনীতভাবে হেসে বললেন, "না, না, মাসখানেক হাসপাতালেই তো চিকিৎসাধীন ছিল। গত সপ্তাহে খুব জটিল একটা অপারেশন করানো হলো যে। এখন বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। ও আজ সকালেই ওর দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে।"

Speak No Evil

তারকনাথের বয়েস হয়েছে। হাতের জোর কমে এসেছে, দৃষ্টিশক্তিও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। তার কাজে এই দুটো জিনিসেরই বড় প্রয়োজন। টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারি, বুকশেলফ কতবার সে তো একা একাই করে দিয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই কাজ সে করে আসছে।

এবারে সময় হয়েছে, করাত-বাটালি তুলে রাখার।

কথাটা কন্ট্রাক্টর সাহেবকে বলাতে উনি ক্ষুণ্ণ হলেন ঠিকই, তবে সমস্যাটাও বুঝলেন। বললেন, "আমি কি চাইছিলাম জানো? এই বছরটা অন্তত শেষ করে নাও। তুমি আমার এতদিনের পুরনো লোক। তোমার ভরসায় আমি আরো দুয়েকটা বড় কাজ ধরে ফেলেছি যে!"

তারকনাথ সবিনয়ে অস্বীকার করলো। "আমি দেশে চলে যাচ্ছি বাবু। আমি যন্ত্রে আর হাত লাগাবো না।"

কন্ট্রাক্টর সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপরে বললেন, "বেশ। আমার একটা শেষ অনুরোধ অন্তত রাখো। তোমার মতো অভিজ্ঞ লোক আমি এফুনি তো আর পাবো না। সবে ওই ছোট্ট বাড়িটায় হাত দিয়েছি। তুমি মনের মতো করে ওইটার কাজটা করে দাও। আমার সাথে এতকাল থাকলে, আর আমার এই কথাটা রাখবে না তারকনাথ?"

তারকনাথ মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে আর কিছু বলতে পারলো না। কন্ট্রাক্টর সাহেব লোক ভালো। তার সঙ্গে বহুকালের সম্পর্ক। তাই মুখে সে কিছু না বলতে পারলেও, ভেবে নিলো যে দায়সারাভাবে কাজটা উতরে দেবে। তার জীবনের শেষ কাজটা যদি ভালো নাও হয়, তার জন্যও সে কোনো অনুশোচনাও করবে না।

ঠিক চার মাস বাদে যেদিন কাজ শেষ হলো, কন্ট্রাক্টর সাহেব এসে সব দেখলেন, বুঝলেন, আর জানলেন যে তাঁর বলা কথাগুলো শুধুমাত্র পালন করা হয়েছে। মনও দেওয়া হয়নি, মানাও হয়নি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তারকনাথের হাতে বাড়িটার চাবিটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "এই বাড়িটা তোমাকেই দেওয়ার জন্য শুরু করেছিলাম তারকনাথ। তোমাকেই দিলাম। তোমার কথা ভেবেই এটা বানাতে বলেছিলাম।"

Hear No Evil

শিশুটি একমুনে বালির ওপরে হাঁটু মুড়ে বসে খেলা করছে। দূর থেকে ক্রমাগত ভেসে আসছে টেউয়ের শব্দ, আর সেই টেউয়ের শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ৭ থেকে ৭০ এর সমুদ্র স্রোতের আনন্দোচ্চাস।

খুব ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে একটা ছোট্ট বালতি, একটা ছোট্ট কোদাল, কিছু বোতলের ঢাকনা, আর কিছু হাবিজাবি দিয়ে, শিশুটি একটি দুর্গ বানানোর চেষ্টা করছে। বালতি উপুড় করে দুটো টাওয়ার বানিয়ে তার সঙ্গে ব্রিজের সংযোগ করা হয়েছে।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্ণের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

যদিও তার দুর্গের দেওয়াল তেমন মজবুত হয়নি, তবুও সে অনেকক্ষন ধরে কুড়িয়ে আনা বিনুক, ছিপি, কিছু কাঠি, আর আইসক্রিমের কাপ ইত্যাদি দিয়ে দুর্গ এবং তার রক্ষাকারী হিসেবে অনেক সেপাই, সান্দ্রীকে বানিয়ে তার ওপরে বসিয়েছে।

শহরের রাজপথের ওপরে প্রবল শব্দের সঙ্গে ছুটে চলা গাড়ির শব্দ এই অফিসটার ভেতরে প্রবেশ না করলেও, অন্যান্য শব্দ কিন্তু কিছু কম নয়। ক্রমাগত টেলিফোনের রিংটোন, ফাইলের আর কাগজের খসখসানি, কি-বোর্ডের উপরে ক্রমাগত আঙুল চালানোর শব্দ, দুয়েকটা কথার আওয়াজ, হাসির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। কর্মরত লোকটিও কিন্তু তার চারিপাশে একটা দুর্গ বানাবারই চেষ্টা করছে। অ্যাসাইনমেন্টস আর ডেডলাইনস, নাস্বারস এণ্ড ফোরকাস্টিং, ক্লায়েন্টস এণ্ড কন্ট্রাক্টস হচ্ছে তার বালির টাওয়ার, আর তার জন্য প্রফিটের সেপাই, আর অ্যানুইটির সান্দ্রী হচ্ছে দুর্গরক্ষীরা।

শিশুটির এবং লোকটির চিন্তাভাবনার ভিত্তি এবং দৃঢ় বিশ্বাসের কাঠামোটা হচ্ছে, গুঁড়ো থেকে গড়া।

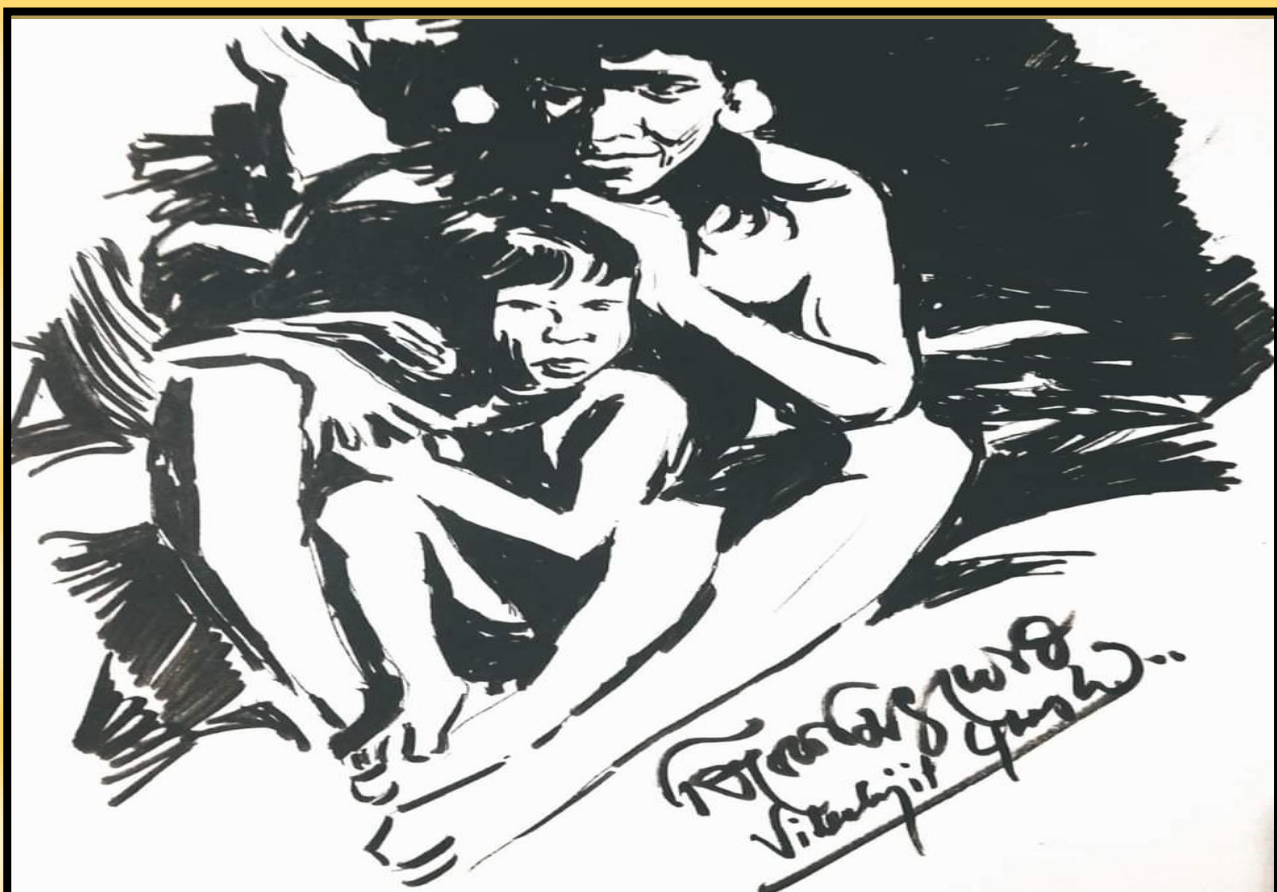
দুজনের মিল কেবলমাত্র এই একটি জায়গাতেই।

তবে অমিলটা যে কোথায়, সেটাই এবার বলি।

এই দুই রকমের দুর্গের মধ্যে কোনোটাই যে চিরস্থায়ী নয়, সেটা আমরা সবাই জানি।

শিশুটি জানে তার দুর্গের পরিণতি কি হবে। এর জন্য তার মনে কোনোরকম দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ, হতাশা কিছুই নেই। বিকেলের ঢেউয়ের ধাক্কায় তার দুর্গটি যখন ভেঙ্গে পড়বে সে আনন্দে উদ্বেলিত হবে। শব্দ করে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠবে, আর তার পরে বাবার হাত ধরে বাড়ি চলে যাবে।

এদিকে লোকটি কিন্তু তার দুর্গটাকে সমস্ত ঢেউ, ঝড়, ঝঞ্ঝার আঘাত থেকে আপ্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে যাবে। সে শুধু ভাববে তার দুর্গ যদি সশব্দে ভাঙে, তাতে তো তার হার্টবিটের শব্দই বাড়বে।



আঁকা - বিবেকজিত ঘোষ

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

জীবন গণিত

~ দেশব্রত বিশ্বাস

কারা যেন বলেছিলো, জীবন তার নিজের হিসাবে চলে,
নিজের হিসেব মানে অংক মেনে,
আর অংক তো সাধারণত সূত্র মেনেই মেলে।
যেমন ধরা যাক, এক আর এক যোগ করলে
যোগফল দুই মেলে।
মানে মেলাটা যেমন অনিবার্য, যোগফলটাও ততটা,
অথচ তোমার হাতে হাত রেখে যখন হয়েছিলো জীবনের অনেকটা পথ হাটা,
একে একে দুই হবার ঠিক আগের ক্ষণেই হাতড়ে আর তোমায় পাশে পাই নি,
স্লেট, পেন্সিল, খাতা ক্যালকুলেটর সব ফেলে
ঘেটেও যখন আমার শূন্যতার হিসাবে মেলে নি,
সময় কানে কানে ফিসফিসিয়ে মিলিয়ে দিয়ে বলে,
যোগ, গুণ, ভাগ সব করেছে, শুধু প্রেমকে বিয়োগ করো নি।



আঁকা - বিবেকজিত ঘোষ

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

বিসর্জন

~ অবন্তিকা বাগচী

এক বছর পূর্তি হতে চললো। ভাবলেই বুকের ভেতরটা কেমন যেনো মুচড়ে ওঠে তারকের মায়ের। পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই শব্দের আওয়াজে সম্বিত ফেরে বিন্দুর। প্রণাম করতে যায় ঠাকুর ঘরে। ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা দেখিয়ে পিছনে ফিরে শাশুড়ি মাকে দেখে জিজ্ঞাসা করে গৌরী - "কেমন আছে মা আপনার শরীর?"

ধুনো দেখাতে দেখাতে বলে গৌরী, "বিকেলের দিকেই বোধ হয় ঘুমালেন, তাই আর ডাকলাম না।"

ঠাকুরঘরে চুপ করে বসে আছে বিন্দু। শুধু চোখটা ছলছল করছে। আজ যেনো একটু বেশিই মনে পড়ছে তারকের কথা। চা নিয়ে মাকে ডাকে গৌরী।

চা খেতে খেতে মনে করে এই একটা বছর। তারক চলে গেলো সেই পুজোর আগে আগে। ডাক্তার দেখে বলেছিল হৃদরোগে আকস্মিক মৃত্যু। তাই অকালে চলে গেলো। মানতে কষ্ট হলেও এই কটা মাসে গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে নিয়েছে বিন্দু। কিন্তু গৌরী যেন মন থেকে মেনে নিতে পারেনি; তারা যে এখনও দুজনেই দুজনের জন্য।

সংসারের উপার্জনের মানুষ চলে গেলে যে কতটা কষ্ট করে দিন চলতে থাকে সে তাদের থেকে ভালো কেউ জানেনা। তবে ভাগ্যিস ওই তারকের বন্ধুর বাড়িতে রান্নার কাজটা পেয়েছিল গৌরী। তাই দিন চলে যায় কোনমতে।

হঠাৎ বিন্দু জিজ্ঞাসা করে গৌরীকে, "হ্যাঁ রে মা, শুনলাম তুই ওই যে প্রীতমের বাড়িতে কাজ করিস তার নাকি শরীরটা বেশ কয়েকদিন অসুস্থ শুনলাম কি হয়েছে রে? কোনো কঠিন ব্যামো নাকি?"

গৌরীর মুখে একটা আলতো হাসি। বললো, "ও আমি জানিনা, অতশত জিজ্ঞাসা করিনা"

কেমন যেন অদ্ভুত লাগল বিন্দুর। যে মেয়েটা একটা বিড়াল ছানারও কষ্ট দেখতে পারেনা। সেই মেয়েটা এমন অদ্ভুত ব্যবহার করলো। যাইহোক আর মাথা ঘামায়নি বিন্দু।

দিন কাটতে থাকলো। আজকাল একটু বেশিই খুশি থাকে গৌরী আগের থেকে। তাতে খুশিই হয় বিন্দু।

দেখতে দেখতে দুর্গাপুজোর সময় চলে এলো। পুজোয় মা মেয়ে ঘুরেও এলো।

কিন্তু পুজোর মধ্যেই হঠাৎ খারাপ খবর। যে বাড়িতে গৌরী কাজ করতো মানে সেই বাড়ির মালিক, প্রীতম এর মৃত্যুর খবর। একই পাড়ায় থাকতো বিন্দুরা। খবর পেয়ে খুব কষ্ট পেলো বিন্দু। তারকের মতই বয়স হবে, হয়তো বা একটু বড়। ছেলের কথা মনে করতে থাকে বিন্দু।

কিন্তু অদ্ভুত ভাবে গৌরীর মুখে কোনো খারাপ লাগার চিহ্নই নেই।

ঠাকুরঘরে মা দুর্গার সামনে চলে গেলো গৌরী। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। বলে উঠলো গৌরী - "অসুর বধ হল গো, অসুর!"

বিন্দু পিছন থেকে শুনে কেঁপে উঠলো, 'এ কি বলছে গৌরী!'

আবার বলতে লাগলো গৌরী, তারকের ছবির সামনে বসে। "তুমি যাওয়ার আগে প্রায়ই বলতে বুকের ব্যথাটার কথা, কিন্তু আমি বুঝিনি। তাই এতটা সময় লেগে গেলো অসুর বধ হতে।"

বিন্দুর পা কাঁপতে লাগলো। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। বসে পড়লো মাটিতে সশব্দে।

কিন্তু গৌরীর সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। সে আপন মনে কাঁদতে থাকলো।

আবারও বলে উঠলো গৌরী, "তুমি বলেছিলে বুকের ব্যথায় নাকি ওই ওষুধ খেয়ে কাজ হয়েছিল তোমার বন্ধু প্রীতমের। তাই সে এনে দিয়েছে সেই ওষুধ বাইরের শহর থেকে। কিন্তু তোমার বুকের ব্যথাটা না কমায় চিন্তা

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

হতো যে আমার। তাই তোমার চলে যাওয়ার আগে আগে ঘরে ওই ওষুধের শিশিটাই আমার মনে সন্দেহ

জাগিয়েছিল। একাই চলে গেলাম ডাক্তারের কাছে তোমায় না জানিয়ে। পরীক্ষা করলো তারা। জানতে পারলাম, এই ওষুধ দিনের পর দিন খেলে হৃদরোগে মৃত্যু অনিবার্য। বুঝতে পারিনি গো তখন কেন দিনে দিনে অসুস্থ হচ্ছিল তোমার শরীর। যতদিনে বুঝলাম আর কিছুই করার ছিলনা গো।।"

কাঁদতে লাগলো গৌরী। বিন্দুর সারা শরীর ঘামতে লাগলো বৌমার কথাগুলো শুনে। এভাবে কষ্ট পেয়েছে তার একমাত্র ছেলেটা; সে জানতেও পারলনা, কিছু করতেও পারলনা। কত কষ্ট করে মানুষ করেছিল ছেলেটাকে। ওই তো ছিল তাদের একমাত্র বল ভরসা।

গৌরী একটু জোরেই কেঁদে বলে উঠলো - "তারপর জানতে পারলাম তোমায় অনেকদিন থেকেই সহ্য করতে পারতেনা ওই প্রীতম, তোমার ব্যবসার উন্নতির কারণে। একই পাড়ায় একই ধরনের কাপড়ের দোকানের মালিক ও। কিন্তু তোমার ব্যবসা চলত রমরমিয়ে। তাই সামনে বন্ধু, ভাই ভাই করলেও আড়ালে ছক কষেছিল ওই অসুরটা। তাই এবার ওরই দেওয়া ওষুধে ওকেই শেষ হতে হলো, জানতেও পারলনা সেটা ও।"

বিন্দু সব শুনে বসে পড়লো মাটিতে। ভাবলো এই জন্যই তাহলে ওই বাড়ির রান্নার কাজটা নিয়েছিল গৌরী।

বিসর্জনের কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগলো। গৌরীর মনে অদ্ভুত আনন্দ হতে লাগলো। মনে মনে ভাবলো শান্তি পেলো এতদিনে তারকের আত্মা।

এক আকাশ সমান সুখ

~ গীতকার

পরনে আটপোরে শাড়ী, হাতে শাখাপলা আর মাথা ভর্তি সিঁদুর নিয়ে মিত্র বাড়ির দরজায় পাইলট প্রহেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাইলট আর্নিকা। আশেপাশের সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আর সবাই নানারকম মন্তব্য করছে। পাশের বাড়ির দাস গিম্মি শর্মা বাবুকে বলছেন "শাখাপলা আর সিঁদুর পরে কি সতী সাজতে চাইছে নাকি? এই করে কি সে আমাদের মত হয়ে যাবে নাকি!" রায় গিম্মি প্রহেলের মা অর্থাৎ আর্নিকার শাশুড়িমা প্রহেলিকা বসুকে বললেন "দিদি তুমি এই অনাচার করলে? আর রীতিনীতি মেনে এই বিয়ে দিয়ে, এই মেয়ে মানে এই 'হিজড়' কে ঘরে তুললে!"

চোখে অশ্রুফণা ভিড় করেছে নব বিবাহিতা আর্নিকার। তার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলো প্রহেল, মুখ খুলে কিছু বলার আগেই তার মা আর্নিকার আরেক হাত ধরে তাকে বললেন,

"তুই আমার সেই ছোট্ট অনিক যে কিনা একটা পিঁপড়েকে কেউ মারলেও কাঁদত, সেই কোমল মনের অনিক হোস বা যে নিজের আসল সন্তাটাকে মেনে নিয়ে কঠিন অস্বপচার পার করে, এই সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে আর্নিকা হোস, তুই আমাদের অনিই থাকবি। যাকে আমার ছেলে ছোটো থেকে বন্ধু না পরিবার ভাবত আর আমিও। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তুই নিজেকে বুঝতে পারিস আর প্রহেল তোর পাশে থাকতে থাকতে বুঝতে পারে তুই ছাড়া ও অচল। ও তোর ওই কোমল মনের প্রেমে পড়েছিল আর তোর সেই মায়াবী চোখের মায়ায় বেধে ছিল। তাই তুই মন খারাপ করিস না। সবার চোখে তুই যেমন ভালো হতে পারবি না, তেমনই আমাদের চোখে তুই পরীই থাকবি। যে অনি এত কঠিন লড়াই পার করে ফেললো সে কি এই দুর্বল মানুষগুলোর বেরোয়া কথাকে পরোয়া না করে এগিয়ে যেতে পারবে না? যাতে সে সমাজের আরো যারা এমন মানুষ আছে যাদের নিজেদের সন্তা প্রকাশ করতে ভয় বা কুণ্ঠা বোধ হয় তাদের অনুপ্রেরণা হতে পারে। বল পারবি না?"

এরপর মিস্টার মিত্র সেই পড়শিদের বললেন, "আমার দুই সন্তানের বিয়ে তো সবাই বয়কট করলেন। এখন বাড়ি বয়ে যখন মন্তব্য করতে এসেছেন, তখন কিছু মুখে দিয়ে যান। আমরা মানুষকে মানুষই মনে করি আর কিছু ভাবি না।"

আর্নিকার সুন্দর করে গৃহপ্রবেশ হলো মিত্র বাড়িতে।

আর্নিকা তার সদ্য বিবাহিত স্বামী ও প্রাণপ্রিয় বন্ধু প্রহেলকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমরা তো রোজই আকাশে উড়ি। কিন্তু এই লড়াইগুলোতে পরিবার আর তোর মত সঙ্গী পাওয়া এক আকাশ সমান সুখ।"

প্রহেল হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "তুই তো আমার সেই আকাশ।"

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

শুধু ভালোবাসা

~ শ্রীমন্ত ভদ্র

যে মন কঠিন থাকে দেহটার ফাঁকে
ভালোবাসা পেলে সেই গলে যাবে ফের,
সহস্র ডালপালা ঝড়ে যদি কাঁপে
দেহটা ভাঙতে পারে আগল দেহের।

কতটা মনের তুমি কাছাকাছি এসে
দ্বিধাহীন প্রেম দিয়ে পৃথিবী সাজাও,
অবেলার রোদ থাকে কার্নিশে ভেসে
প্রতিকূল স্রোত তবু পাল তুলে নাও।

এখনো জলের গায়ে জীবনের দাগ
বাতাসে সাহস দেয় সমাজকে ফাঁকি
অভিমান ঘেঁসে কিছু জমা হয় রাগ
জ্যোৎস্না রঙের সুতো পরিয়েছে রাখি।

আমাদের হেঁটে যাওয়া আলপথ ধরে
বৃক্ষ শরীর থেকে নেমে আসে ছায়া
যদি মন ভেসে ওঠে মনের গভীরে
নদীর দেহতে জাগে সমুদ্র-মায়া।



ছবি - সৌভিক সেনগুপ্ত

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

কেমন তুমি

~ দিপায়ন মল্লিক

বৃষ্টিভেজা দুপুর,
তোমার পায়ের নূপুর,
আজ না হয় অন্যকিছু ভাবব।

পাতা বেয়ে জল ,
আজও পাইনি মনে বল...
তোমায় নিয়ে লিখব কোন কাব্য।।

সন্ধ্যাবেলার আড্ডা,
তোমায় দেবো সবটা,
পথ ভুলে নয় তোমার বাড়িই যাবো !!

চপ মুড়ি আর কাটলেট,
চিনামাটির কাপ প্লেট...
ভাঙবে জেনেও তোমায় মনটা দেব।

আমার গিটারের তার,
তোমার বেয়ারা আবদার ।
এবার থেকে তোমায় সাথে নেব...।

রেডিওতে গান,
তোমার অভিমান!
ভাঙবে মান? শুনবে? গান গাইব?

খেলছে ছেলের দল,
তোমার চোখ ভরা জল।
চোখের পাতায় ধরবে? আমার রুমাল দেব?



ছবি - শুভদীপ সাহা

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

ব্রাবন দ্বীপের রহস্য

- সোমতীর্থ গাঙ্গুলি

1

আজ সকালেই এসে পৌঁছেছি ব্রাবন আইল্যান্ডে।

আসতে খুব ব্যামেলা হয়নি। গ্রীণ আইল্যান্ডের সাউথ কোস্ট অবধি ট্রেনেই এলাম, তারপর লঞ্চ করে ব্রাবন দ্বীপ। আজ রাতটা দ্বীপের জঙ্গলে কাটিয়ে কাল ভোরে আবার রওনা হবো। আমরা যাবো ব্রাবন দ্বীপের দক্ষিণ দিকে। আপাতত মিকা নদী ধরেই এগিয়ে যাবো এটাই ঠিক হয়েছে।

আমরা বলতে আমি আর তিঙ্গা। তিঙ্গা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। ও একজন অকারা, তাই আমার খুব সুবিধে হয়েছে। অকারারা হলো ব্রাবন আইল্যান্ডের আদিবাসী। এই দ্বীপে নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অকারাদের গ্রাম।

আমরা একটা অদ্ভুত উদ্দেশ্যে ব্রাবন দ্বীপে এসেছি। অদ্ভুত হলেও আমার কাছে রোমাঞ্চকর কিছু লাগেনি।

বিভূতি সান্যাল নামে এক বাঙালি ভদ্রলোক এই ব্রাবন দ্বীপে আসেন বছর দুই আগে, কিন্তু এখন একেবারেই বেপাত্তা। ভদ্রলোক এসেছিলেন হাওর নিয়ে রিসার্চ করতে।

ব্রাবন দ্বীপের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের যে অংশ তা পৃথিবীর সব থেকে ভয়াল ভয়ঙ্কর হাওরদের আস্তানা। মোট আটত্রিশ প্রজাতির হাওর আছে এই অঞ্চলে। হাওরদের এই বিপুল জলরাশির ভিতরে ছোট্ট একটা দ্বীপ আছে। এই দ্বীপে একটা টিলা সোজা উঠে গেছে। অকারারা এই টিলাকে বলে ভয়ের টিলা। টিলার পাশেই দেখা যায় অতি প্রাচীন জীর্ণ একটি ক্যাসেল। অনেকেরই বিশ্বাস বিভূতিবাবু ওই ক্যাসেলেই লুকিয়ে আছেন আর হাওরদের নিয়ে রিসার্চ চালাচ্ছেন।

আমরা এসেছি বিভূতিবাবুকে খুঁজে বের করতে।

তবে আমরাই প্রথম নয়, গত বছর টম সীমান্স নামে এক মার্কিনি ভূ-পর্যটক আসেন বিভূতিবাবুর খোঁজে। কিন্তু সেই সীমান্সও এখন বেপাত্তা।

পরের দিন ভোরে যখন মিকা নদীর তীর ধরে আমি আর তিঙ্গা যাচ্ছি তখন অকারাদের একটি গ্রাম দেখতে পেলাম। আখতারুল সাহেবের কাছে শুনেছিলাম মিকা নদীর পাড়ের গ্রামগুলোতে অকারাদের সাথে বেশ খাতির হয়ে গিয়েছিল বিভূতিবাবুর। ওনাকে লেখা চিঠিতে বিভূতিবাবু জানিয়েছিলেন। (আখতারুল সাহেব হলেন গ্রীন আইল্যান্ডের পুলিশ চিফ; বিভূতিবাবুকে খোঁজার ব্যাপারে উনিই আমাকে নিযুক্ত করেন।)

হঠাৎ মনে হলো একবার এই গ্রামে ঢুকে বিভূতিবাবুর ব্যাপারে যদি কিছু খোঁজ খবর পাওয়া যায় তো মন্দ কি।

তিঙ্গাকে নিয়ে চললাম ওই গ্রামটার দিকে।

বেশ ভালো ভাব জমে গেল গ্রামের সর্দার কারুলির সাথে। বললেন বিভূতিবাবু ওনাদের গ্রামে বেশ কদিন ছিলেন। প্রায়ই উনি অকারা ছেলেদের নিয়ে সমুদ্রে যেতেন হাওর দেখতে, তবে বিভূতিবাবুর একটি বিশেষ জাতির হাওরের প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

প্রশান্ত মহাসাগরের এই জায়গায় এক অতি বিরল প্রজাতির হাঙর পাওয়া যায়। পৃথিবীর আর কোথাও এরকম হাঙর পাওয়া যায় বলে কেউ শোনে নি।

সবুজ রঙের বড় হাঙর, অকারাদের ভাষায় এই হাঙরগুলোকে ডাকা হয় তাগোরা বলে। অন্য হাঙরদের তুলনায় এই তাগোরাগুলো সাংঘাতিক ধূর্ত আর হিংস্র। এদের প্রিয় খাদ্য জ্যান্ত মানুষ। মানুষ পেলে এরা আর কিছুই চায় না।

এক সময় সমুদ্র থেকে অকারাদের প্রচুর জেলে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসতো না, সবাই জানত ওদের তাগোরাতে নিয়ে গেছে।

অসম্ভব ধূর্ত এরা, এদের শিকার করা যায় না।

শুধু পঞ্চাশ কি ষাটটাই আছে মাত্র এই মহাসমুদ্রে।

বিভূতিবাবু এই তাগোরা নিয়েই খোঁজ খবর করছিলেন। তাগোরা নিয়ে অকারাদের পুঁথিপত্র ঘাটাঘাটি করছিলেন।

কিন্তু বিভূতিবাবু এই তাগোরাদের নিয়ে পড়লেন কেন? ভাবলাম উনি হাঙর নিয়ে গবেষণা করছেন, স্বভাবতই বিরল প্রজাতির হাঙরের প্রতি ইন্টারেস্ট তো থাকবেই।

তবে অকারাদের এই গ্রামে এসে বিভূতিবাবু আরো একটা জিনিস নিয়ে চর্চায় মেতে উঠেছিলেন এবং সেটা একেবারেই ভিন্ন বিষয়।

অকারাদের মধ্যে কালা জাদু তন্ত্র সাধনার খুব চল আছে। অনেকটা ভুড়ুইজমের মতো। এই গ্রামে থাকাকালীন মাঝেমধ্যেই দুই তন্ত্র সাধিকার কাছে যেতেন বিভূতিবাবু। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো বিভূতিবাবু এই গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার দিন দশ পর ওই দুই তন্ত্র সাধিকাও হাওয়া হয়ে যায়।

টম সীমান্স এই গ্রামে এসেছিলেন কিনা জিজ্ঞেস করাতে কাবুলি মাথা নেড়ে না জানালেন।

কাবুলি আমাদের দুপুরে খেয়ে যেতে বললেন।

দারুণ আয়োজন করা হয়েছে। আমরা সব খেতে বসেছি অমনি এক বৃদ্ধ অকারা এসে সর্দার কাবুলিকে কানে ফিসফিস করে কি একটা বললেন।

কাবুলি যেন কিরকম ভেঙে পড়ল!

আমি জানতে চাইলাম কি হয়েছে। অকারা সর্দার কাবুলি যা বললো তাতে আমার হাড় হিম হয়ে গেল।

কয়েক মাস ধরেই গ্রাম থেকে দুজন করে তরুণ অকারা নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে প্রথম অমাবস্যার দিনটিতে। গত মাসে হয়েছে, তার আগের মাসেও হয়েছে। আর এই মাসে আজ হলো সেই প্রথম অমাবস্যা। কেউ কিছুই দেখেনি, শুধু সকালে উঠে পাওয়া যাচ্ছে না তরুণ দুটিকে। বুড়ো অকারা বললেন কোনো কারণে এরা এই রাতগুলোতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল কিন্তু আর ফিরে আসে নি।

কাবুলি আমাদের ভীষণ করে অনুরোধ করলেন এই রাতটা থেকে ব্যাপারটা একটু দেখতে।

আমি জাত শিকারি, আমার ব্যাগ থেকে শট গানটা বের করে রেডি করে নিলাম।

গ্রামটার একেবারে মধ্যবর্তী এলাকায় রয়েছে একটা বিশাল ওয়াচ টাওয়ার। সবাই বলে ব্রাবন টাওয়ার্স। এই ব্রাবন টাওয়ার্সের উপরে আমি তিঙ্গা আর অকারা সর্দার কাবুলি উঠে পড়লাম। ওয়াচ টাওয়ারের ছাদ থেকে নাইট ভিশন দূরবীন দিয়ে দেখতে থাকলাম।

রাত যখন প্রায় দুটো তখন দক্ষিণ দিকের আকাশে দেখলাম কি যেন উড়ে আসছে। নাইট ভিশন দূরবীন তাক করতেই দেখলাম বিশাল সাইজের দুটো ঈগল পাখি উড়ে আসছে গ্রামটার দিকে।

গ্রামটাকে একটা পাক দিয়েই দুটো ঈগল নেমে গেল বসতির দিকে। মুহূর্তের মধ্যে কিছু একটা ছোঁ মেরে উড়ে এলো আবার। দূরবীন দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম দুটি অকারা তরুণকে তুলে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে ঈগলগুলো। তরুণ দুটি প্রাণপন নিজেদের ছাড়াবার চেষ্টা করছে কিন্তু বিশাল ঈগলগুলোর ট্যালন চেপে বসেছে ওদের ঘাড়ো। আমি দেরি না করে শট গান বার করে গুলি চালাতে যাবো। কাবুলি আমাকে পিছন থেকে জাপটে ধরলো "না না ঈগলদের মারবেন না।"

আমি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "কেন?"

তাতে কাবুলি বললো, "ঈগলরূপী ওদের এক ইষ্ট দেবতা আছেন, তাই ঈগল মারা অমঙ্গল।"

কিন্তু এভাবে তো ঈগলগুলোকে ছেড়ে দেওয়া যায়না, ওরা কোথায় অকারা তরুণদের নিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেখা দরকার। আমরা তিনজনেই নীচে নেমে এসে ঘোড়া ছুটিয়ে বিশাল ঈগলগুলোকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

সমুদ্র পাড়ের কাছে চলে এসেছি, দেখলাম ঈগলগুলো অকারা তরুণদের নিয়ে ভয়ের টিলার দিকে চলে যাচ্ছে।

ভয়ের টিলার পাশেই সেই জীর্ণ ক্যাসেল।

আমি সময় নষ্ট না করে একটা ভেলায় তিঙ্গাকে নিয়ে ভেসে পড়লাম। এই রহস্যের উদঘাটন করতেই হবে।

কাবুলি বললো কালই ও দলবল নিয়ে ক্যাসেলে হাজির হচ্ছে। ও পাড় থেকে আমাদের টাটা করতে লাগলো।



আঁকা - বিবেকজিত ঘোষ

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

এখন জোয়ার আছে, আমাদের বাইতে হচ্ছে না, এমনি এমনিই ভয়ের টিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এগিয়ে যাচ্ছি আর ভাবছি এই জলেই কত বীভৎস প্রজাতির হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে সাদা ফসফরাস আরোও যেন রহস্য বাড়িয়ে তুলেছে...

ভাসতে ভাসতে কেমন তন্দ্রা এসে গেছিলো। হঠাৎ তিঙ্গা আমাকে ডেকে তুললো।

"সাহেব দেখো ওটা কি!"

দেখি আমাদের ভেলার সাথে সাথে চলছে একটা সবুজ আলো।

আমি দেখতেই আলোটা যেন সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে গেলো।

"জুমবা" বলে উঠলো তিঙ্গা।

2

কোন ঘটনা থেকে শুরু করবো বুঝতে পারছি না।

ভয়ের টিলায় পৌঁছে এই পুরোনো জীর্ণ ক্যাসেলে যে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে সব কটাই সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর। বিভূতিভূষণ সান্যাল যে কি ভয়ঙ্কর লোক তা কেউ কোনো দিন লিখে বোঝাতে পারবে না। এমন হিংস্র আর নিষ্ঠুর লোক খুব কম মানুষই দেখেছেন। হাঙরের ইন্টারেস্ট যে আসলে অসং উপায়ে রোজগারের লোভ, সেটা অনেকেই জানতে পারেনি। খুব প্ল্যানমাফিক এগিয়েছেন বিভূতিবাবু, হাতিয়ার করেছেন অকারা তরুণদের, অকারা দুই তন্ত্র সাধিকাদের আর হাতিয়ার করেছেন অকারাদের একমাত্র আশ্চর্য বশীকরণ তন্ত্র 'তামশিরা'।

আমি মোটামুটি ঘটনাগুলো যেমন ঘটেছে পরপর বলে যাচ্ছি।

প্রায় ভোর চারটে নাগাদ আমরা ভয়ের টিলার নীচে পৌঁছলাম। জোয়ার তখন অনেকটাই ক্ষীণ, কিছুক্ষণ পর ভাটা শুরু হবে।

আমাদের অনেকটাই উপরে উঠতে হবে, হয়তো সারাদিন লেগে যাবে। আমাদের সাথে খাবার ছিল, আমি আর তিঙ্গা খাওয়া দাওয়া করে টিলার উপর উঠতে শুরু করলাম।

প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ ভয়ের টিলার উপরে উঠে সেই জীর্ণ ক্যাসেলটাকে দেখতে পেলাম।

সিবাস্তিন ক্যাসেল।

জর্জ সিবাস্তিন বলে একজন ধনকুবের ব্যবসায়ী তৈরি করেছিলেন ক্যাসেলটি।

এখন একদম পরিত্যক্ত, কেউ থাকে না।

সিবাস্তিন ক্যাসেলের পাশে একটা বিশাল বড় ডোম দেখলাম, মনে হলো কোনো অডিটোরিয়াম গোছের কিছু হবে। একটা ঢালু চাতাল ক্যাসেল আর ডোমটাকে কানেক্ট করেছে।

বিকেল পেরিয়ে এখন সন্ধ্যা, দেখলাম চাতালটার উপর কি যেন নড়ছে চড়ছে।

চোখে দূরবীন দিতেই দেখলাম দুজন অকারা মহিলা একটি ত্রিকোণ কাঁচের বাক্স চাতালটার উপর টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্লেবের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

তিস্জাকে দেখাতেই ও বললো, “সাহেব মনে হচ্ছে এরাই সেই দুই তন্ত্র সাধিকা, বিভূতিবাবু যাদের থেকে তন্ত্র শিখেছেন। ওরা ডোমের দিকে ত্রিকোণ যেই যন্ত্রটা নিয়ে যাচ্ছে ওটা হচ্ছে তামশিরা যন্ত্র।”

তিস্জার কাছেই তামশিরা জিনিসটা কি সেটা জানলাম। ওর বাবা কাকারাও এক সময় তামশিরা করতো।

অকারাদের মধ্যে অনেকরকম বশিকরণ পদ্ধতি আছে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো তামশিরা। এখানে শুধু মানুষ কেন পৃথিবীর যে কোনো জন্তু জানোয়ারদেরও তামশিরা বা বশিকরণ করা যায়।

“হাঙ্গর কে করা যায় বশীভূত?”

“যায়”

“ঈগলকে?”

“যায়।”

তিস্জা হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে, বুঝে গেছে আমি কি ভাবছি।

“আর ওই যন্ত্রটা?”

ত্রিকোণ কাঁচের যেটা।”

“ওটাই তো তামশিরা করার যন্ত্র।”

তিস্জা আমাকে বিস্মারিত বলতে লাগলো।

কাউকে বশে আনতে গেলে একটি হলুদ কাপড়ে সারা শরীর আগা গোড়া ঢেকে ওই কাঁচের ত্রিকোণ ঘরে ঢুকে বশ করার মন্ত্র জপ করতে হয় এবং যেই মানুষ বা প্রাণীটিকে বশ করতে চাইছি তার কথা ভাবতে হয়।

অভিজ্ঞতা থাকলে মিনিট দশের মধ্যেই বশিকরণ সম্ভব।

অকারাদের বশিকরণ পদ্ধতি তামশিরার ব্যাপার স্যাপার শুনে আমি চমকে উঠছিলাম। হঠাৎ ছায়া করে আমার আর তিস্জার উপর কি যেন একটা এসে পড়ল।

একটু ঠাণ্ডা করতেই দেখি আমরা দুজনেই একটি জালে আটকে পড়েছি। একটি জাল আমাদের দুজনকেই আঁঠুপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে, আর যিনি জালটি একটি নেট গান দিয়ে ছুঁড়েছেন তিনি আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে।

অন্ধকার আবছা আলোয় দেখলাম সাদা দাড়িমুখো এক বৃদ্ধ কোমড়ে হাত দিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

নেট গানটা ঝোলায় পুড়ে বুড়ো এবার একটা হারপুন বের করলো। হারপুন হলো হাঙর মারার অস্ত্র। ট্রিগার টিপলেই দড়ি বাধা একটা বিশাল তীর গিয়ে লাগে শিকারের গায়ে।

সেকি কে এই বুড়ো?

আমাদের হারপুন দিয়ে মারবে নাকি!

হারপুন বার করে বুড়ো আমার দিকে তাক করলো।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

আমি পাশেই কিছু কাটার আওয়াজ পেলাম।

দেখলাম তিঙ্গা ওর ধারালো ছুরি দিয়ে ওর জাল কেটে ফেলেছে।

বুড়ো কিছু বুঝে উঠবার আগেই তিঙ্গা ওর হাত লক্ষ করে ছুরিটা ছুঁড়ল।

ছুরিটা বিদ্যুৎ গতিতে বুড়োর হাত ছুঁয়ে পিছনের গাছে গিয়ে লাগলো আর তাতেই বুড়োর হাত থেকে হারপুনটা পরে গেল। ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে বুড়ো কিছু ঠাওরই করতে পারলো না।

ততক্ষণে তিঙ্গা ওর জালটা দিয়ে বুড়োকে বেঁধে ফেললো নিমেষের মধ্যে। বুড়ো হাঁফাতে লাগলো।

তিঙ্গা আমার জালটাও খুলে দিল।

আমি বুড়োর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম,

"কে তুমি?"

বুড়ো দেখলাম বাঁধা পড়েও দমেনি। বললো,

"আগে বলো তোমরা কারা?"

আমি বললাম, "আমরা গ্রীন আইল্যান্ডের থেকে আসছি বিভূতি সান্যালের খোঁজে।

বুড়ো ক্ষীণ হাসি হেসে বললো,

"আমিও এসেছিলাম ওর খোঁজে...."

এখন অনেকটা অন্ধকার হয়ে এসেছে, আমি টর্চের আলো জ্বাললাম।

বুড়োর চেহারাটা পরিষ্কার।

বড় চুল আর মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে যে লোকটা আমার সামনে বসে আছেন, তিনি আর কেউ নন, ভূ-পর্যটক টম সীমান্স!

টম সীমান্স-এর কাছ থেকে বিভূতিবাবু সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম।

আমাদের অনুমান নির্ভুল যে উনি অকারা তন্ত্র সাধিকাদের নিয়ে এই সিবাস্তিন ক্যাসেলেই উঠেছেন, কিন্তু কেন?

সিবাস্তিন ক্যাসেলের লাগোয়া যে অডিটোরিয়াম, বিভূতিবাবু সেই অডিটোরিয়ামটির সদ্যবহার করতে চান। এই অডিটোরিয়ামটি আর পাঁচটা অডিটোরিয়ামের থেকে একদম আলাদা।

জর্জ সিবাস্তিন শুধুমাত্র একজন ধনকুবের ব্যবসায়ী ছিলেন না, উনি আসলে ছিলেন একজন জলদস্যু।

অডিটোরিয়ামটি বিশাল একটি ছোট খাটো স্টেডিয়ামের মতো।

আর অডিটোরিয়ামটির মেঝের ভিতরে রয়েছে ফুটবল মাঠের মত বড় বিশাল একটা কুয়ো।

সেই কুয়োর অনেক গভীরে অনেক নীচে যেখানে কুয়োটা গিয়ে শেষ হয়েছে, রয়েছে সাতটা বড় বড় লম্বা লম্বা টানেল যা সমুদ্রের গভীর অবধি চলে গিয়েছে। দস্যুবৃত্তি করে লুটের মাল সব এই পথে নিয়ে আসা হতো।

এই কুয়োর মধ্যে তাগোরাদের ধরে ট্রাপ করছেন বিভূতিবাবু।

তামশিরা করে ঈগল পাখিদের বশ করে অকারাদের ধরে নিয়ে আসছেন আর নিষ্কেপ করছেন ওই কুয়োর মধ্যে।

মানুষের গন্ধ পেয়ে চলে আসছে তাগোরারা টানেলগুলোর মধ্য দিয়ে। আর একবার এসে পড়লেই তাগোরাগুলোকে মেরে ওদের সবুজ চামড়াগুলো চরা দামে চোরাবাজারে বিক্রি করছেন বিভূতিবাবু।

টম সীমাসের কাছ থেকে আরোও একটা জিনিস জানতে পারি।

তাগোরাদের সংখ্যা এমনিতেই অনেক কম। ওদের মধ্যে কয়েকটা গোনাগুনতি রানী তাগোরা আছে, যেগুলো নাকি সাইজে অনেক বড় আর ওদের মধ্যে একটার মাথায় একটা ছোট তরমুজের সাইজের মনি আছে। সল্ট ডিপোজিশন আর বাইলুমিনেন্স থেকে তৈরী এই মনি। সবুজ রঙের জ্বলজ্বলে মনি। অকারাদের ভাষায় যার নাম জুমবা। জুমবা হচ্ছে রহস্যময় সবুজ সামুদ্রিক মনি।

যেকোনো মনির দাম ঠিক হয় তার উজ্জ্বল রং, তার স্বচ্ছতা, তার কাটার ধরণ আর তার availability-র ওপর। এক্ষেত্রে রানী তাগোরার মনি অতি বিরল, উজ্জ্বল আর স্বচ্ছ। সবথেকে বড় কথা সমুদ্রের তলার চাপে মনে হয় যেন পল কাটা হিরে, তাও আবার একটা তরমুজের সাইজের।

তাগোরাদের এই রানী তাগোরা আর তার মনির ব্যাপারে বিভূতিবাবু প্রথম জানতে পারেন অকারাদের গ্রামে গিয়ে।

প্রতিবার উনি তামশিরা করে অকারা তরুণদের কুয়োর মধ্যে ফেলার সময় ভাবেন এইবার নিশ্চয়ই সেই রানী তাগোরা এসে হাজির হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি।

টম সীমাস সমুদ্র বিশারদদের কাছ থেকে জেনেছে যে তাগোরারা খুব বিরল প্রজাতি আর সারা বিশ্বে একমাত্র এখানেই পাওয়া যায়। আর এদের মধ্যে বিরলতর হচ্ছে রানী তাগোরা আর তাদের মধ্যে বিরলতম হচ্ছে মনিওয়ালা রানী তাগোরা।

পৃথিবীতে শুধু একটাই আছে, তাও আবার এই সমুদ্রেই।

জানতে পারলাম টমকে অনেকদিন ধরেই বিভূতিবাবু বন্দি করে রেখেছিলেন; কালকেই টম বন্দিশালা থেকে পালায়। বিভূতিবাবুর নেট গান, হারপুন দুটোই চুরি করে টম।

টম সীমাস বলল, "তোমরা যদি তামশিরা একটু কাছ থেকে আজ দেখতে চাও তাহলে ওই চাতালটায় চলে যেতে পারো।

ওখান থেকে অডিটোরিয়ামের ডোমের উপরে ওঠার একটা সিঁড়ি আছে। অডিটোরিয়ামের ডোমের উপর বিশাল একটা স্কাইহোল আছে, সেখান থেকে দূরবীন লাগিয়ে তোমরা অডিটোরিয়ামের ভিতর কি হচ্ছে দেখতে পাবে।"

আমার কৌতূহল ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অবশ্যই ওই অডিটোরিয়ামের ভিতর কি হচ্ছে বা হবে দেখা দরকার। তিঙ্গা গাছ থেকে ওর ছুরিটা নিয়ে নিলো।

আমি আর তিঙ্গা টম সীমাসকে সঙ্গে নিয়েই চাতালটায় চললাম।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

চাতালটা ক্রস করে সিঁড়ি দিয়ে অডিটোরিয়ামের ডোমের উপর উঠছি একটা বোটকা গন্ধ নাকে লাগলো। বোটকা কিন্তু চেনা চেনা। ডোমে উঠে পড়লাম। মাথার উপরে বিশাল আকাশ, অগণিত তারা; আমাদের পিছনে ভয়ের টিলা আর সামনেই প্রশান্ত মহাসাগর।

স্কাইহোলের ভিতর দূরবীন তাক করেই দেখলাম নিচেই বিশাল একটা কুয়ো। তার পাশে ত্রিকোণ কাঁচের ঘরটা রাখা। ওর ভিতরে আগা গোড়া একটা হলুদ চাদর মুড়ি দিয়ে একজন ধ্যান করতে বসেছে খুব সম্ভব দুই তন্ত্র সাধিকার একজন, সামনেই একটা সিংহাসনের মতো উঁচু জায়গায় ক্লোক গায়ে এক বছর পঞ্চাশের লোক। জুম করে দেখলাম লোকটার ছুঁচল ছাগল দাড়ি আর নিষ্ঠুর চোখ দুটো!

বিভূতিভূষণ সান্যাল, কাঁচের ঘরে বসে তন্ত্র সাধিকা কেমন যেন ঢুলছে মনে হয় তামশিরা শুরু হয়ে গেছে।

দুজন অকারা তরুণ দেহরক্ষীর মতো বিভূতিবাবুর সিংহাসনে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে এরা বশীভূত।

কুয়ের সামনে আরো দুজন অকারা তরুণ শুয়ে আছে, এদের বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। হুকুম হলেই কুয়ের ভিতর ফেলে দেওয়া হবে।

এবার দেখলাম বিশাল বড় একটা ঈগল কোথা থেকে যেন উড়ে এসে ওই ত্রিকোণ ঘরটার সামনে বসলো।

চোখ গুলো অস্বাভাবিক রকমের লাল।

বুঝলাম এই ঈগলটির উপরই এখন তামশিরা চলছে।

ঈগলটি খপ খপ করে ওই শুয়ে থাকা অকারা তরুণদের তুলে বিশাল কুয়োটার মধ্যে ফেলে দিলো।

অনেক অনেক নীচে জলে পড়ার শব্দ পেলাম।

টোপ পড়েছে, তাগোরারা এসে পড়বে এইবার।

আমাদের চারদিকে বোটকা গন্ধটা যেন বাড়ছে।

হঠাৎ তিঙ্গা লাফিয়ে উঠলো। সাহেব টম সীমান্সও দেখলাম কেমন থম মেরে গেছে।

আমরা রয়েছি অডিটোরিয়ামের ডোমের মাঝামাঝি।

সিঁড়ির দিকটা দিয়ে কি একটা কালো জন্তু উঠে আসছে।

বোটকা গন্ধটা এখন বেশ পাওয়া যাচ্ছে। চেনা গন্ধ চিড়িয়াখানায় বাঘের খাঁচার সামনে পাওয়া যায়।

চাতালের পিছন থেকে হালকা একটা আলো এসে পড়েছে সেটাতাই দেখা যাচ্ছে জন্তুটাকে।

একটা প্রমান সাইজের ব্ল্যাক প্যান্থারের চোখগুলো লাল জ্বলজ্বল করছে। হিংস্র ক্যানাইনগুলো মাংসের লালসায় লকলক করছে। এটাকেও কি তামশিরা করা?

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্লেবের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

প্যান্থারটা গন্ধ শুকতে শুকতে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। পিছন দিকটা তুলে সামনের দিকে থাবাগুলো এগিয়ে দিয়েছে। লক্ষণ ভালো নয় এখনই লাফ দেবে, আমি বেগতিক দেখে শট গান তাক করলাম কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে অমানবিক ক্ষিপ্ততায় প্যান্থারটা আমাদের উপর লাফিয়ে পড়লো।

আমি টমকে টেনে নিয়ে একপাশে ছিটকে পড়লাম।

আর তিঙ্গা উল্টোদিকে লাফাতে গিয়ে স্লিপ কেটে ডোম থেকে গড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারে তিঙ্গা কোন দিকে পড়লো বুঝতেই পারলাম না।

ঝনাত ঝনঝন করে আওয়াজ হলো, প্যান্থারটা এসে পড়েছে স্কাইহোলটার কাঁচের উপর।

কিছু কাঁচ ভেঙে অডিটোরিয়ামের ভিতর পরে গেল; নীচ থেকে মৃদু উত্তেজনা শুনলাম, ওরা জানতে পেরে গেছে ছাদে কিছু একটা হচ্ছে।

আমি সময় নষ্ট না করে শট গান চালিয়ে দিলাম।

গুলিটা শুধু প্যান্থারের মাথাতেই লাগলো না, যেন ওটাকে উড়িয়ে নিয়ে একদম নীচে গভীর খাদে ফেলে দিলো। খাদটায় সরাসরি সমুদ্রের জল এসে ঠেকেছে একটা খাঁড়ির মতো। অনেক নীচে ছায়া শব্দ পেলাম। আমার নিশানা নির্ভুল, ওটার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তিঙ্গাকে দেখা যাচ্ছে না, আমি বারকয়েক নাম ধরে ডাকলাম। না কোনো সাড়া শব্দ নেই, তিঙ্গাও কি জলে পরে গেল?

হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে নূপুরের আওয়াজ শুনলাম, আরেকটা হালকা শিস। খুব সম্মোহনী শিস দিচ্ছেন যিনি নূপুর পরে এসে দাঁড়িয়েছেন; আধো আলো-অন্ধকারে বুঝতে পারলাম ইনি আরেকজন অকারা তন্ত্র সাধিকা।

শিসটা এমন যে আমরা নিখর হয়ে গেলাম, আমি আর টম সীমান্স যেন একেবারে প্যারালাইসিস হয়ে গেছি, আঙ্গুলগুলোও নাড়াতে পারছি না।

আবছা আলোয় দেখলাম মহিলাটি একটি ছোট বাঁশির মতো কি একটা বার করলেন, উনি টমের দিকে ফিরে বাঁশিতে ফুঁ দিতেই আধ ইঞ্চির একটা ছোট সূচ টমের ঘাড়ে এসে বিঁধল, টম ধরাশায়ী।

আমি নড়তে পারছি না, শট গানটা হাতেই ধরা আছে কিন্তু কোনো লাভ নেই।

খচ করে কি একটা কানের তলায় এসে ফুটলো।

গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

3

জ্ঞান ফিরলে আস্তে আস্তে চোখ খুললাম, দেখি আমি ঝুলছি। হ্যাঁ ঝুলছি। বিশাল অডিটোরিয়াম, নীচে বড় কুয়োটা।

আমাকে সিলিং থেকে একটা লোহার চেনের সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

অডিটোরিয়ামের ভিতর হালকা আলো। গোল অডিটোরিয়ামটা একটা স্টেডিয়ামের মত। গোল করে অনেকগুলো লাল মশাল জ্বলছে।

আমার মাথার অনেক উপরে ভাঙা স্কাইহোল। আলাগা কাঁচ যেকোনো মুহূর্তে আমার উপর এসে পড়তে পারে।

নীচে কুয়োর এক পাশে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে টম সীমান্সকে। আমার আর ওর দুজনের ব্যাগ প্যাক রাখা রয়েছে কুয়োর কানার উপর।

ত্রিকোণ কাঁচের ঘরটা খালি, দুই তন্ত্র সাধিকাকে দেখতে পেলাম না।

"কি হে আখতারুলের টিকটিকি আছো কেমন?"

আমাকে দেখে চিৎকার করে নিচ থেকে জিঙ্কোস করলো বিভূতিভূষণ সান্যাল। বসে আছে সিংহাসনটায়, পায়ের কাছে বড় ঈগলটা ঝিমচ্ছে।

বিভূতিবাবুকে দেখে যেন মনে হচ্ছে কাউন্ট ড্রাকুলা। ক্লোক আর ছাগল দাড়ি থেকে স্বয়ং শয়তান যেন ফুঁড়ে বেরোচ্ছেন।

আমি কিছু উত্তর দিলাম না।

"একটু পরেই যে আপনি তাগোরাদের পেটে চলে যাবেন।"

বিদ্রূপের হাসি হাসলেন বিভূতিবাবু।

আমি বললাম, "আমি তাগোরার পেটে গেলেও আপনার নিস্তার নেই বিভূতিবাবু, অকারা সর্দার কাবুলি দলবল নিয়ে আসছে, ওরা এসে সবই বুঝতে পারবে।"

"ওদের কি করে বশ করতে হয় সেটাও আমার জানা আছে।"

গর্জিয়ে উঠলো বিভূতিবাবু।

আমি মনে মনে ভাবলাম তা নিশ্চয়ই আছে, নাহলে ইচ্ছা করে ঈগল বশ করে অকারা তরুণদের ধরে আনছেন। ঈগল সম্পর্কে অকারাদের একটা দুর্বলতা এমনতেই আছে আর সেটাই এই পাষাণটা কাজে লাগিয়েছে।

"সারা ব্রাবন আইল্যান্ড আমি হাতের মুঠোয় করবো। হয়ে উঠবো এই দ্বীপের অধীশ্বর।"

"আপনি ভুল করছেন, কতগুলো বিরল প্রজাতির হাওর মেরে আপনি চোরা বাজারে বিক্রি করছেন। এটা তো সাংঘাতিক অন্যায়।"

"আমাকে ন্যায় অন্যায় শিখিও না ছোকরা।

আজ অনেক কটা টোপ আছে।

মনিওয়ালারানী চলে আসতে পারে।"

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

কথাগুলো বলে ভীষণ রকম বাজে হাসি হাসতে লাগলেন বিভূতিবাবু।

"বেশি দেরি করে লাভ নেই, খেলা শুরু হয়ে যাক।"

আমি ভাবছি তিঙ্গার কথা। কোথায় যে গিয়ে পড়লো। আদৌ কি বেঁচে আছে?

বিভূতিবাবুর হুকুমে একজন অকারা রক্ষী অডিটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মনে হয় ওই তন্ত্র সাধিকাদের ডেকে আনতে গেলেন।

"আমার দুজন সহকারী আছেন, ওদের থেকেই আমি হাঙর ধরার তালিম পেয়েছি। ওরা হলো ওয়ারী আর জু।"

গদগদ হয়ে বললেন বিভূতিবাবু।

বুঝলাম উনি ওই দুই তন্ত্র সাধিকাদের কথা বলছেন।

অডিটোরিয়ামের বাইরে কারা এসে দাঁড়িয়েছে।

ডোকার অনুমতি চাওয়া হলো।

বিভূতিবাবুর তালির সাথে সাথেই অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করলো ঝুমুর পায়ে দেওয়া সেই মহিলাটি, যিনি আমাকে আর টম সীমান্সকে সূচ বিঁধিয়ে অজ্ঞান করেন। ওর সাথে আরেকজন মহিলাও ঢুকলেন, ইনি হলুদ কাপড়ে আগা গোড়া ঢাকা। বুঝলাম এরাই দুই তন্ত্র সাধিকা ওয়ারী আর জু।

হলুদ কাপড়ে আগা গোড়া মোড়া তন্ত্র সাধিকাটির উদ্দেশ্যে বিভূতিবাবু বলে উঠলেন,
"জু এইবার তৈরি হও।"

বুঝতে পারলাম এই তন্ত্র সাধিকাই তামশিরা করার জন্য ত্রিকোণ ঘরে ঢুকে বসবেন।

কি হতে চলেছে ভেবে আমার ভীষণ ভয় লাগছে। হলুদ কাপড়ে ঢাকা ওই তন্ত্র সাধিকা জু এবার কাঁচের ত্রিকোণ ঘরে ঢুকে তামশিরা শুরু করবে, আর ওই বিটকেল বড় ঈগলটা তার খেলা দেখাবে।

কি সাংঘাতিক!

এবার দেখলাম একজন অকারা তরুণ টম সীমান্সের দড়ি খুলে দিল।

কোনোরকমে উঠে বসেছে টম, সূচের বিষের এফেক্ট এখনো যায়নি। আমার যা অবস্থা ওরও তাই, কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব।

মুচকি হাসি দিয়ে শয়তান বিভূতিভূষণ বললো, "নাও শুরু কর এবার।"

কাঁচের ঘরে ঢুকে পড়ল হলুদ কাপড়ে ঢাকা তন্ত্র সাধিকা জু।

আর অন্য সাধিকা ওয়ারী গিয়ে বসল বিভূতিবাবুর পাশে।

কুয়োর অনেক অনেক নীচে জল হালকা হালকা নড়ছে মনে হচ্ছে। উপরে দড়ি ছিঁড়লেই সটান পরে যাবো কুয়োর ভিতরে; আর তারপর সব শেষ।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>



আঁকা - বিবেকজিত ঘোষ

তামশিরা শুরু হয়েছে, ত্রিকোণ কাঁচের ঘরের ভিতরে তন্ত্র সাধিকা ঢুলছেন আর অদ্ভুত সুরে মন্ত্র পড়ছেন।

বিভূতিবাবুর পায়ের কাছে ঈগলটা দেখলাম চাঙ্গা হয়ে উঠলো। লাফিয়ে লাফিয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে।

উপর থেকে বেশ দেখতে পাচ্ছি ওটার চোখগুলো কেমন অস্বাভাবিক হয়ে আসছে।

হলদে কাপড়ে ঢাকা তন্ত্র সাধিকা এবার আরো জোরে জোরে ঢুলছে। বেশ জোরে জোরে তামশিরা তন্ত্রের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে।

ঈগলটা ছটফট শব্দ করে কুয়োর কানায় এসে বসলো; এবার উড়ে হয় আমাকে নয় তো টম সীমান্সকে কুয়োর মধ্যে ফেলবে। আমাকে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না। লোহার চেনের সঙ্গে একটা দড়ি দিয়ে আমার কাঁধ দুটো বাঁধা। ঈগলটার শক্ত ঠোঁটের খোঁচায় এই দড়িটা অনায়াসেই ছিঁড়ে যাবে।

ঈগলটা এবার মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে, প্রথম টার্গেট মনে হয় আমিই।

হঠাৎ একটা চিল চিৎকার দিয়ে ঈগলটা উড়তে লাগলো। আমাকে প্রদক্ষিণ করছে।

নীচ থেকে বিভূতিভূষণ সান্যালের পৈশাচিক হাসি কানে আসছে।

এরপরই ঘটে গেল কতগুলো অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

ঈগলটা সোজা নীচে নেমে গিয়ে বিভূতিবাবুর ঘাড়ে চেপে বসলো।

বিভূতিবাবু যেন একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। কি যে ঠিক হচ্ছে ব্যাপারটা বুঝতেই পারলেন না। ওদিকে ওনার পাশে বসে থাকা তন্ত্র সাধিকা ঈগলটা কে ওনার ঘাড় থেকে নামাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

দুই অকারা দেহরক্ষী তরুণ বল্লম দিয়ে ঈগলটাকে মারতে যাবে কিন্তু তার আগেই দুটো তীর তাদেরকে বিদ্ধ করলো। যে সে তীর নয়, হাঙর মারা তীর হারপুন থেকে বেরিয়েছে।

কাঁপা কাঁপা হাতে হারপুন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন টম সীমান্স।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্লের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

ঈগলটা ততক্ষণে বিভূতিবাবুকে শূন্য তুলে নিয়েছে। আত্ননাদ করে উঠেছে ওনার পাশে বসে থাকা তন্ত্র সাধিকা। আরেকজন কিন্তু আগা গোড়া হলদে কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় মন্ত্র পাঠ করে যাচ্ছেন ত্রিকোণ কাঁচের ঘরে বসে।

ঈগলটা বিভূতিবাবুকে নিয়ে অডিটোরিয়ামটা একটা পাক দিয়েই কুয়োর একদম নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

আমি নীচে তাকিয়ে দেখলাম অনেক অনেক নীচে জলে বিভূতিবাবু পড়লেন। বিশাল জোরে ছলাৎ করে একটা আওয়াজ হলো, তারপর সব চুপ।

এদিকে দেখি কাঁচের ঘরের তন্ত্র সাধিকা আশ্তে আশ্তে ওর চাদর খুলে ফেলছে; তবে চাদরের ভিতর থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন উনি তন্ত্র সাধিকা জুনন, উনি আমার প্রিয়পাত্র শ্রীমান তিঙ্গা। দেখে তো আমার চক্ষু চরকগাছ!

বাবা কাকার বিদ্যে ভালোই কাজে লাগিয়ে ফেলেছে ছোকরা।

তিঙ্গাকে দেখে সত্যি আমি অবাক,
হলুদ চাদরটা মেঝেতেই পড়ে রইলো।

রাগে প্রায় বাঘিনীর মতো গর্জন করে তিঙ্গার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো অন্য তন্ত্র সাধিকা ওয়ারী।

দুজনের মধ্যে সাংঘাতিক লড়াই বেঁধে গেল। মনে হলো দুটো হিংস্র পশু একে অন্যকে মেরে ফেলার জন্য মরণপন লড়ছে।

দু'জনেই যেন পেশাদার কুস্তিগীরের মতো লড়াই করছে। আমি তিঙ্গার গায়ের জোর কেমন জানি, অবাক হয়ে দেখে যাচ্ছি কি অসম্ভব কৌশলে ওই তন্ত্র সাধিকা ওয়ারী ওর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। দুজনই দুজনকে মোক্ষম প্যাঁচে ফেলে কাবু করতে চাইছে।

দেখলাম তিঙ্গা ওর ছুরিটা বার করে ওয়ারীকে আঘাত করতে চাইছে কিন্তু ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মত তিঙ্গার হাত মুচড়িয়ে ওয়ারী ছুরিটা ওর থেকে নিয়ে নিতে চাইছে।

শেষমেষ ছুরিটা মেঝেতে পড়ে যেতেই ওয়ারী একটা ল্যাং মেরে তিঙ্গাকে মেঝের উপর ফেলে দিলো। তারপর পাশে পড়ে থাকা হলুদ চাদরটা নিয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বুঝতে পারলাম, তিঙ্গার গায়ের জোর বেশি হতে পারে কিন্তু এই যুদ্ধ শাস্ত্রে ওয়ারীর কৌশলী দক্ষতা অনেক বেশি।

নিমেষের মধ্যেই তিঙ্গাকে আগাপাশতলা ওই হলুদ চাদরটা দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো ওয়ারী।

তারপর ওর ঘাড়ের উপর চেপে বসে নিজের বাঁ পায়ের নূপুরের খাঁজ থেকে যে জিনিসটা বার করে আনলো সেটা আগে আমরা দেখেছি।

সেটা একটা ছোট বাঁশি। এই বাঁশিটাতেই ফুঁ দিয়ে তার থেকে একটা বিষাক্ত সূচ দিয়ে বিদ্ধ করেছিল আমাদের।

তিঙ্গার ঘাড়ের উপর চেপে বসে সেই ছোট বাঁশি ওর গলার পাশে ঠেসে ধরলো ওয়ারী, তারপর মুখ নামিয়ে নিয়ে এলো সেটাতে ফুঁ দেবে বলে।

কিন্তু প্রায় তখনই একটা জাল এসে পড়লো ওয়ারীর উপর।
জালটা পুরোপুরি আবদ্ধ করে ফেললো তন্ত্র সাধিকা ওয়ারীকে।

নেট গান চালিয়ে দিয়েছে টম সীমান্স।

এবার বাইরে হইহই আওয়াজ শুনলাম, হয়তো কাবুলি সর্দার ওনার দলবল নিয়ে এসে পড়েছেন। হঠাৎ কুয়োর নিচ থেকে একটা বিকট আত্ননাদ ভেসে এলো। গলা শুনেই বুঝলাম তাগোরা এসে পড়েছে আর তার খাদ্য হয়ে পড়েছেন বিভূতিবাবু।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

কুয়োর গভীরে তাকাতেই দেখলাম কেউ বাঁচবার জন্যে ছটফট করছে কিন্তু আস্তে আস্তে সব শান্ত হয়ে গেল। আর ঠিক তখনই খেয়াল করলাম সবুজ রঙের একটা আলো খেলে বেড়াচ্ছে জলের তলায়। মনিওয়াল রানী তাগোরার প্রসাদ হয়ে গেলেন বিভূতিবাবু স্বয়ং। শিকারের হাতে শিকারি কাবু। আমাকে উপর থেকে কারা টানছে। উপরে তাকাতেই দেখলাম স্কাইহোলের পাশ থেকে কাবুলি আর ওর কয়েকজন সাথী লোহার চেনটা উপরে টেনে তুলছে; আমাকে ওরা স্কাইহোলটা দিয়েই বার করবে।

কাবুলিকে সব জানানো হলো। দুই তন্ত্র সাধিকাকেই কাবুলির হাতে তুলে দেওয়া হলো। তিঙ্গা এসে পড়েছিল অডিটোরিয়ামের পিছন দিকের বারান্দায়। ওখানেই বিশ্রাম করছিল তন্ত্র সাধিকা ওয়ারী। ওকে মাথায় আঘাত করে অচেতন করে ওর থেকে হলুদ চাদর নিয়ে নেয় তিঙ্গা।

তারপরের ঘটনা তো আমরা দেখেছি।

আমরা যখন ব্রাবন দ্বীপে ফিরে আসছি সমুদ্রের জলে আমাদের ফলো করে আসছিল একটা সবুজ আলো। পাড়ে আসার কাছাকাছি জল থেকে মাথা ওঠালো প্রাণীটি। একটা বিপুল সবুজ রঙের হাওর। মাথায় জ্বলজ্বল করছে তরমুজ সাইজের সবুজ মনি।

জুমবা যেন আমাদের ধন্যবাদ জানালো।

বই এর রিভিউ

কলমে – সৌপর্ণ গাঙ্গুলী

বই এর নাম - নিশি

লেখক - প্রভাত দে সরকার



বইটি সম্পর্কে কিছু বলার আগে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলা জরুরি। নিশি নামটা শুনেই আমাদের কী মনে হয়? ভৌতিক ঘরানার কিছু ডার্ক গল্প হবে নিশ্চয়ই, তাই নয় কি? কিন্তু এই গল্পটি একেবারেই Horror Genre-এর মধ্যে পরে না। আমার মনে হয় কোন বই পড়তে শুরু করার আগে বইটি সম্পর্কে আপনার ধারণা অনেকটাই প্রভাব ফেলে আপনার ভালো লাগা খারাপ লাগার ওপর।

এই গল্পটি একটা সুন্দর প্রেক্ষাপটে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মূল গল্প এগিয়ে চলেছে। গল্পের নায়ক রজনীকান্ত রায়, একজন শিক্ষিত যুবক, টালমাটাল পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখে এবং নিজের শিক্ষা ও বিদ্যার সঠিক প্রয়োগ করে কিভাবে মনুষ্যত্বের যথাযথ পরিচয় দেয় সেই নিয়ে এই গল্প। রজনী তার ঠাকুরদা, নিশিকান্ত রায়ের দৌলতে শেখে লাঠি চালানো, বন্দুক চালানো এবং আরো কিছু গুপ্ত বিদ্যা। পরবর্তীকালে কলকাতা এসে শেখে তাইকোণ্ড। একটি চাকরি জোগাড় করে সপ্তাহে একদিন করে গ্রামে গিয়ে গ্রামের ছেলেদের বিদ্যে দান করত সে। তার মূল লক্ষ্য তার যোগ্য শিষ্য খুঁজে বের করা। ইতিমধ্যে ভুল চক্রে প'রে জীবন চলে যায় তার প্রিয় ছাত্রের। এখান থেকেই বদলে যায় রজনীর জীবন, সে হয়ে ওঠে নিশি। কিন্তু শেষ অবধি কি রজনী খুঁজে পাবে তার যোগ্য উত্তরসূরি? সেটা জানতে হলে বইটি পড়তে হবে।

দারুণ একটা ছন্দে চলতে থাকে এই গল্প, এমন সুন্দর কৌশলে দুটি টাইমলাইন চলতে থাকে পাশাপাশি (রজনী এবং তার ঠাকুরদা নিশিকান্ত) যে কখনই আপনি পড়তে পড়তে অধৈর্য হয়ে উঠতে পারবেন না। সবশেষে বলতে চাই, এটি একটি মিশ্র ঘরানার গল্প। Genre-এ লেখা যায় - Periodical Thriller, Drama and Intense Emotional. গল্পটি অবশ্যই একবার পড়ে দেখা উচিত। 'নিশি' নামকরণটি মূলত রূপক অর্থে করা হয়েছে, গল্পটি পড়লে নামকরণের স্বার্থকতা অবশ্যই বুঝতে পারবেন।

যদি ১০ এর মধ্যে এই বইটিকে নম্বর দিতে হয়, তবে আমি এই বইটিকে দেব ৭.৫।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

সিনেমা হলেও সত্যি

~ সুলগ্না ব্যানার্জী



সিনেমা – বেলাশুরু

পরিচালক – নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখার্জী।

প্রযোজক – উইন্ডোজ প্রোডাকশনস।

অভিনয় – সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়,
স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ
সেনগুপ্ত, খরাজ মুখার্জী, অপরাজিতা
আচ্য ও অন্যান্য।

শেষ বেলায় 'বেলা শুরু' দেখতে গেছিলাম। একটা নতুন গান "অবশেষে ভালোবেসে চলে যাব" বেশ ভালো লেগেছে apart from the lyrics ... খামখা চলে যেতে যাব ক্যান???? যাই হোক, চলে যাওয়া যাবে না, আর এই নিয়েই বেলা শুরু। উইন্ডোজের কাজ একটু melodramatic হলেও অনুভূতিকে বরাবরই নাড়া দিতে সক্ষম। সকলেরই অভিনয় ভালো লেগেছে। তবে স্বাতীলেখা ম্যাম এখানে সকলকে ছাপিয়ে গেছেন।

আমি চাকরি সূত্রে যেখানে থাকতাম, কর্মস্থল থেকে দেওয়া সেই বসবাসের জায়গায় একজন retired 'তথাকথিত মানসিক ভারসাম্যহীন' জেঠীমা থাকতেন। তখনকার দিনের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অধিকারিণী ও সরকারী চাকুরে। নিজের ভালোবাসার মানুষ অন্য কারোকে বিয়ে করেন, তাতেও তিনি মনের জোর নিয়ে বেঁচে ছিলেন। তিনি আজীবন কুমারী থেকে যান।
বাধ সাধলো প্রেমিকের মৃত্যু।

কথায় আছে "স্বামীর দেহ অবশেষের উপর অধিকার আছে, প্রেমিকের নেই"।
তিনি Alzheimer's-এ আক্রান্ত হলেন। নিজের একটা দুনিয়া তৈরি করে নিলেন। কিছু কারণবশত retired হবার পর আর ওই আবাসনে কর্তৃপক্ষ তাঁকে থাকতে allow করে না। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝেই তাঁর সেই ঘরে ফেরত আসতে চান এবং দিনের যে কোনো সময়ে চলেও আসেন।
অনেকেই তাঁর উল্লেখগুলো পাকা চুল, চেহারা দেখে অতিরিক্ত ভয় পায়, অনেকে বলে তিনি নাকি black magic জানেন!

এক রাতে আচমকা আবাসনের ভিতরে ঢুকে পড়ায় সবাই অতিরিক্ত ভয় পেয়ে যায়, অনেকের বাড়ি ফেরার জন্য রাতে ট্রেন কিন্তু কেউ ভয়ে দরজা খোলার সাহস পাচ্ছে না, সিঁড়ির বাইরেই যে জেঠীমা বসে! সবার মুখ থমথমে, জেঠীমা বোধহয় চোখ দিয়েই ভয় করে দেবে!

Anyway, কেউ problem এ থাকলে বসে chill না করতে পারা আমি -নেমে পরলাম ground-এ। সবাইকে safely বার করে জেঠীমার সামনে দিয়ে নিয়ে গেলাম। Felt nothing less than a hero ...
সেই প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম। রোগা শীর্ণকায় চেহারা, চোখ কোটরে ঢুকে গেছে, সাদা চুল,বোবার মত দাঁড়িয়ে, প্রথম দেখায় ভয় তো দূর(কারণ আমি তখনও জানতাম না ওনার ব্যাপারে কিছু) অসম্ভব মায়্যা হল। সারা রাত ঠায় বাইরেই বসে রইল,যদি কেউ দরজা খোলে। পরের দিন সকালে চা দিতে গিয়ে দেখি চলে গেছেন।

ওনার ব্যাপারে detail-এ জানার পর নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি। হয়তো সেই প্রেমিক থাকলে বেলা শুরু হত। অন্তত সেই প্রেমিকের দেওয়া কোনো চিঠি, পুরাতন diary-র ঘটে যাওয়া ঘটনা, একটা বাসি ফুল বা প্রেমিকের প্রিয় রংএর শাড়ী আঁকড়ে কেটে যেত অবশিষ্ট বোবা জীবন, কিন্তু তিনি সেই অধিকার থেকেও বঞ্চিত।
কিছু বেলা শুরুর আগেই শেষ হয়ে যায়।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

কেসটা এখনও পেনডিং

~ গল্পের তরী Originals

(লেখক টিম : বৃষ্টি, সোমতীর্থ, পরমব্রত এবং দেশব্রত)

বয়স তখন মাত্র ১৬ তানির। সবে সবে যৌবনকাল অনুভব করতে শিখছে তানিশা। ওর স্কুলের অনেক ছেলেরাই কথা বলতে চাইতো, দেখতে চাইতো তাকে। কিন্তু তানির সেদিকে কোনো মাথা ব্যথা নেই। সে চলে তার নিজের খেয়ালে। তানি দশম শ্রেণীতে পরে। প্রথম বোর্ড পরীক্ষার চাপের পাশাপাশি শরীরে বসন্তের ছোঁয়া। মন যতই চেয়ে থাকুক না কেন যে পড়াশুনাতে মন দেবে, শরীরের এক নতুন অদ্ভুত আমেজ যেন মনকে নাচিয়ে তোলে। সে দেখে যে তার আশেপাশের বন্ধুরা কেমন মিষ্টি ভাবে প্রেম করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইচ্ছে যে তার হয়না তা নয়, কিন্তু যতই হোক সম্ভ্রান্ত পরিবারের রক্ত বইছে শরীরে। হঠাৎ করে কৌতুহলবশত একটা ভুল করে ফেলতে বুক কেঁপে ওঠে। আর সত্যি বলতে ইতিমধ্যেই অনেকগুলো প্রেমের প্রস্তাব পেয়ে গেছে তানি। দেখতে তো সে আর কোন অংশে কম নয় কারো থেকে, এক দু কথায় বর্ণনা করার মত সাধারণ সৌন্দর্য তার নয়। লম্বা গড়ন, লম্বা গোল গোল নিটোল হাত, সুন্দর গোল মুখ আর মুখে মিষ্টি দুটো গজ দাঁত। তার সেই মোহময়ী হাসিতে দাঁত গুলো উঁকি মেলে তার সৌন্দর্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে তোলে। কোমর অবধি সুন্দর কালো চুল ঝুলতে দেখে কত প্রেমিক যে মন হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কারো প্রেমের প্রস্তাবেই হ্যাঁ বলেনি সে। ঠিক করে, যা করবে তা মাধ্যমিকের পর।

আস্তু আস্তু নতুন ক্লাস শুরু হলো। মাধ্যমিক এর জন্য তৈরি হতে অনেক কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে হলো। এমনই এক কোচিং সেন্টারে এলো একটা ছেলে। একদিন এসেই বললো - “এই পা সরা। বসবো।”

অবাক হয়ে গেলো তানি।

মনে মনে বললো - “বাব্বা, এত অ্যাটিটিউড কিসের? অভদ্র কোথাকার!

যাইহোক, পড়া শেষের আগে হয়ে গেলো এক বিপদ; লোডশেডিং।

কিছু সময় পর তানির পাশে বসা সেই ছেলেটা হেসে বলে উঠলো - “এত বড় হয়েও ভয় পাস অন্ধকার কে?”

আরো অবাক হলো তানি। “সব তো অন্ধকার তাহলে দেখলো কিকরে ছেলেটা আমার মুখ, যে আমি ভয় পাই?”

না ভেবে আর, জিজ্ঞাসা করলো, “Why are you saying like this? I am not scared...At all... মানে ...”

বলতে বলতে কেঁপে গেল গলাটা।

কোনো উত্তর দিল না ছেলেটা।

সেদিন রাতে চোখে ঘুম এল না তানির। বারবার মনে পড়ছে ছেলেটার কথা। কি যেন একটা ব্যাপার আছে ওর মধ্যে। সব ছেলে যেন তার সাথে কথা বলার জন্য মুখিয়ে থাকে সব সময়, তার সাথে কথা বলতে আসলেই সবার চাঞ্চল্য যেন বেড়ে যায়। কিন্তু এই ছেলেটা, সে আলাদা। তার মধ্যেই যেন উল্টে একটা টান আছে, একটা মায়্যা আছে। সে তানির সাথে কথা বলার জন্য ততটা ব্যগ্র নয় যতটা অন্যান্য ছেলেরা সাধারণত হয়ে থাকে। তানি তার প্রতি এক অদ্ভুত মায়্যা মিশ্রিত আকর্ষণ অনুভব করে।

যত দিন যেতে লাগলো কেমন অদ্ভুত ভাবে ছেলেটার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকলো তানি। ছেলেটার বিষয়ে খোঁজ নিয়েছে তানি। ওর নাম রুদ্র। ছেলেটা নাকি এই স্কুলে ক’দিন হলো এসেছে। আগে অন্য কোথাও পড়াশুনা করতো, কিছু সমস্যার কারণে এই স্কুলে ট্রান্সফার নেওয়া। ওর সে রকম বন্ধুবান্ধবকেও সেভাবে নজরে পরে নি কোনদিন। তানি কোনো না কোনো অজুহাতে লেট করে ব্যাচে আসতে লাগলো যাতে রুদ্রর পাশে বসতে পারে। এরই মধ্যে একদিন আরো ভালো সুযোগ এলো। রুদ্র সোশ্যাল মিডিয়া তে মেসেজ করলো -

“তোর একটা বান্ধবীর খাতা আমার কাছে আছে,তার নম্বর বা যোগাযোগের উপায় নেই। তুই কি খাতা নিয়ে তাকে দিয়ে দিতে পারবি?”

কিছু না ভেবেই তানি বললো - “হ্যাঁ অবশ্যই। কোথায় দিবি বল”

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

সেই প্রথম স্কুল থেকে স্কুল শেষ হওয়ার আগেই পালানো তানি। আর ছেলেটাও তার স্কুল থেকে।
তাদের প্রথম দেখা ব্যাচের বাইরে কোথাও। অদ্ভুত এক উত্তেজনা।

দুজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একটা বাসস্ট্যাণ্ডে। একটু দূরে দূরে। যাতে কেউ দেখে না নেয়।
তানি আস্তে আস্তে বললো - “দে, খাতা টা।”

“কোনো খাতা আনিনি তো” বললো ছেলেটা।

বুঝে গেল তানি কেন তাকে এভাবে ডাকা আর কেন সেই বা কিছু যাচাই না করেই চলে এলো।

আর বেশি সময় লাগলো না তানি আর রুদ্রর প্রেমের সম্পর্ক শুরু হতে।

কোন কথা ছাড়াই কেমন ভাবে যেন তাদের একটা মিষ্টি সম্পর্ক গজিয়ে ওঠে। কাউকে একে অপরকে আলাদা করে
কোন কথা দিতে হয়নি, যেন এমনই একে অপরের প্রতি একপ্রকার অধিকার ও না বলা বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে।

এরপর সবার চোখের আড়ালে চলতে লাগলো তাদের প্রেম।

“চিঠি লিখে আনলাম তোর জন্য। পরে দেখিস। আসলে ওসব অনলাইনের প্রেমে আমার ঠিক পোষায় না।” - বলেছিল
রুদ্র।

“বেশ। তাহলে আমাদের প্রেম না হয় আলাদাই থাকুক সবার থেকে। আজকালকার যুগের মত নাই বা হলো।” - তানি
চলতে লাগলো চিঠির আদান প্রদান।

৪, ৬, ৮ পাতা; ক্রমশ বাড়তে থাকলো পরিমাণ শব্দের।

সময়ের সাথে সাথে তাদের সম্পর্ক এগিয়ে গেছে; পরিবর্তন হয়েছে, পরিণত হয়েছে। তাদের এই কোচিং পালানো বা
স্কুল পালানো প্রেম অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। এখন তারা প্রায়ই সুযোগ খুঁজে পড়া বাস্ক করে একসাথে সময়
কাটায়, অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটায়। তানি নিজেকে লুটিয়ে দেয় রুদ্রের মধ্যে। রুদ্রের মধ্যে যেন একপ্রকার উড়ো উড়ো
ভাব, ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে দিলেও তানি রুদ্রের মধ্যে যেন কোন বিচলন টের পায় না।

একদিন এক চিঠিতে লেখা পড়ে অবাক হয় তানি।

“তুই কি আদৌ চিনিস আমায়? আমি যে, তুই কি তাকেই ভালবাসিস? পরে ঠকে যাবি না তো?”

রুদ্রর লেখা চিঠিতে কেমন একটা ভয়ের শিহরণ বয়ে গেলো তানির শরীরে।

বাধ্য হয়ে পরের দিনই ডেকে পাঠালো রুদ্রকে।

“কি লিখেছিস তুই? কি এসব? তুই কী বলতে চাইলি? এসবের মানে কি?” প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে তানি।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে রুদ্র চিঠিটার দিকে।

বিড়বিড় করে বলে - “এত আমারই হাতের লেখা কিন্তু এসব তো আমি লিখিনি! কখন লিখলাম?”

আরো অবাক হয়ে যায় তানি।

আস্তে আস্তে যত দিন যায় রুদ্র বদলাতে থাকে। কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলে - “satan মানিস?”

প্রথমদিকে ভয় পেয়ে এড়িয়ে যায় তানি এক দু’বার।

কিন্তু তানির জানা দরকার রুদ্র কেন এভাবে দূরে সরে যাচ্ছে তার থেকে।

একদিন মনে জোর এনে জানতে চায় - “তুই আমায় বল কি এই satan? কি এসব? কেন এরকম হয়ে যাচ্ছিস? চেহারার
কি হাল করেছে?”

রুদ্র নিজের মনেই বলে ওঠে - “সবচেয়ে শক্তিশালী সে। তুই যা চাইবি তাই পাবি, কিন্তু তার জন্য তাকে কিছু
স্যাংক্রিফাইস মানে ত্যাগ করতে হবে। যদি তুই তোর কিছু প্রিয় ত্যাগ করিস তবেই তুই তাকে পাবি...” বলেই কি
যেনো একটা আঁকতে থাকে মাটিতে রুদ্র নিজের আঙ্গুল দিয়ে।

“আর যদি না করিস?” ভয় ভয় বলে তানি

“ধ্বংস হয়ে যাবি তুই” চোখ লাল হয়ে যায় রুদ্রর রাগে।

ভয়েতে কেঁপে উঠলো তানি।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

দিনের পর দিন এভাবে রুদ্রর শেষ হয়ে যাওয়া মেনে নিতে পারছিল না তিনি।
তাই একদিন বলেই বসলো, “আমিও মানবো satan কে। আমারও চাই কিছু।”

এরপর রুদ্রর বলা পদ্ধতিতে চাইতে থাকে তিনি
“চাই শুধু রুদ্রর শরীরের উন্নতি। ও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক” - দিন রাত চাইতে থাকে তিনি।

তিনি রুদ্রর মধ্যে সেই প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে, যাকে প্রথমে তিনি চিনেছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই প্রথম দিনের রুদ্রকে যেন হারিয়ে ফেলছে তিনি। সে তা বুঝতে পেরেই satan-এর কাছ থেকে কিছু চাইবে বলে ঠিক করেছে। সে এখনও বুঝে ওঠেনি যে সে আসলে যা চায় তা সে কিভাবে পাবে বা তার জন্য তাকে তার কি প্রিয় জিনিসের বলিদান দিতে হবে; সেই ব্যাপারে তার এখন কোন ধারণা নেই। এই ব্যাপারে রুদ্রও কোন কথা বলেনা বিশেষ, সব সময় যেন একরকম আনমনা থাকে।

তিনি রুদ্রর কথা মতো মনেপ্রানে ডাকতে থাকে Satan-কে। রুদ্রর বাইরে আর সবকিছু যেন শূন্য মনে হয় ওর।
কেমন নেগেটিভ এনার্জি অনুভব করে তিনি আজকাল। মাথা ভেঁ ভেঁ করে।
এই ভয়াবহ পরিবেশ থেকে বেরোনোর কি কোনো রাস্তা আছে?

চাঁদের আলো এসে পড়েছে ভাঙা মন্দিরটার উপর;
মন্দির না বলে ধ্বংসস্তুপ বললেই ভালো হয়।
ঘন জঙ্গলের ভিতর হাজার উপেক্ষার সাথে দাঁড়িয়ে এই মন্দির। মন্দিরের গা বেয়ে বড় বড় লতা পাক খেতে খেতে
অন্ধকারে মিশে গেছে। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকছে। মন্দিরের হাত দশেকের মধ্যে একটা কুয়ো। একটা করুণ কিন্তু
ভীষণ আকর্ষণীয় বাঁশির শব্দ ভেসে আসছে কুয়োটার ভিতর থেকে। দক্ষিণী শীতল হাওয়া বয়ে চলেছে জঙ্গলের
ভিতর। কুয়োটার দিকে আস্তে আস্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চলেছে তিনি।
পিছনে মন্দিরটা যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।
কুয়ের ভিতর থেকে কেমন একটা ভীষণ মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আসছে। একবার দেখতে ইচ্ছে করছে ভিতরটা।
কুয়োটার কাছে আসতেই তিনি বুঝতে পারলো এটা কোনো স্বাভাবিক কুয়ো নয়। কুয়ের কানায় একটা হাঁড়িকাঠ।
দেখেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো তানির।
বাঁশির শব্দ থেমে গেছে...

“তানি তানি আমি রুদ্র
নীচে নেমে আয়
নীচে নেমে আয়”

রুদ্রর নরম গলার কণ্ঠস্বর- মিষ্টি, মায়াবী; কিন্তু তানি লক্ষ্য করলো হাঁড়িকাঠ থেকে সরু রক্তের একটা ধারা নেমে
আসছে।

ভয়ে দু’পা পিছিয়ে এলো তানি, কুয়ের ভিতর থেকে কিন্তু রুদ্রর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে
“আয় তানি
নীচে আয়
নীচে satan অপেক্ষা করছে”

ভয়ে ঘামছে তানি;
দেখলো একটা কালো অবয়ব কুয়ের থেকে উঠে আসছে, কিন্তু সেটা রুদ্র নয়।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

একটা নরপিশাচ!

একটা চিল চিৎকার দিয়ে তানি পালাতে থাকে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তানি বুঝতে পারলো সে কঠিন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে চলেছে। পায়ের পাশে সাপের মত হিস হিস শব্দ করে কয়েকটা লতা যেন ওর পা দুটোকে জড়িয়ে ধরেছে, অনেক কষ্ট করেও নিজেকে ছাড়াতে পারছে না তানি...

বিছানায় ধড়ফড় করে উঠে বসলো তানি, ঘামে সারা শরীর ভিজ়ে যাচ্ছে। ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে চলেছে, সন্ধ্যা পাঁচটা বাজে। পড়তে যেতে হবে।

বুকের ধুকপুকানিটা বেড়েই চলেছে। হার্ট-অ্যাটাক হবে নাতো? পাশে টেবিলে রাখা জলের বোতলটা খুলে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে নিলো তানি।

জানলার দিকে এগিয়ে যেতেই দেখলো, দূরে ছাতিম গাছটার নীচে নীল সাইকেল নিয়ে রুদ্র অপেক্ষা করছে।

শহরতলীর দিকে রাস্তাটা একটা ফিডার ক্যানেলের দিকে চলে যায়। কিছুটা গেলেই একটা ছোট ব্রিজ পরে, সেটা ক্রস করে কিছুটা এগোলেই একটা পোড়ো বাগানবাড়ি আছে।

এখন একদম নির্জন, বাগান নেই কয়েকটা ঝোপঝাড় আছে। অনেক পুরোনো একটা বসার বেদি আছে। রুদ্র আর তানি প্রায় প্রতিদিনই পড়ার ক্লাস কামাই করে এই নিরিবিলি জায়গায় চলে আসে।

একসাথে আসে না, আলাদা আলাদা। আগে আগে সাইকেল চালাতে থাকে রুদ্র, তানি ফলো করে।

ওরা এই পোড়ো বাগানবাড়ির বেদিটাতে এসে বসলেই

দুজন দুজনের প্রতি অসম্ভব একটা টান অনুভব করে যেন।

রুদ্র যখন তানিকে ছোঁয় তানির শরীরের প্রত্যেকটা শিরা উপশিরা যেন আরো বেশি করে রুদ্রর এই পরশ খুঁজতে থাকে। চাইতে থাকে।

আর তানি যখন চুমু খেতে শুরু করে তখন রুদ্র একটা নিখর পাথরের মত হয়ে যায়। যেন তানির স্নেহ, তানির আদর, তানির খিদে ওর সমস্ত শরীরকে ভালোবাসার সমুদ্রে অবশ করে ফেলছে; নেশার মতো যেন মৃত্যুবরণ করতে চায় সর্বস্ব দিয়ে।

তানির মনে হয় বেদিটার একটা ব্যাপার আছে। বেদিটার কেন এই পুরো বাগানবাড়িটার মধ্যেই একটা ব্যাপার। এটারই পিছনের একটা আউট হাউসে রুদ্র satan-এর উপাসনা করে।

কিন্তু আজ যেন তানি কিছুটা অপ্রতিভ।

- “কি রে তোর শরীর খারাপ নাকি?”

- “না।”

- “তাহলে?”

- “আমার ভয় করছে রুদ্র!”

রুদ্র বলেছে আজ সন্ধ্যায় সে তানির সাথে satan-এর পরিচয় করাবে।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গব্লেস তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

বাগানবাড়ির পিছনের আউট হাউসে, যেখানে বসে রুদ্র satan-এর আরাধনা করে, সেই গোপন স্থানে তানিকেও নিয়ে যাবে।
ওদিকটা তানির যাওয়া হয়নি এখনো।

- "জানিস আমি একটা নাইট মেয়ার দেখেছি।"
- "কী নাইট মেয়ার?"
- "satan একটা কুয়ের মধ্যে থেকে উঠে আসছে, একটা জঙ্গলে।"
- "কোন জঙ্গল?"
- "সে তো জানি না। তবে একটা মন্দির আছে, ভাঙা মন্দির।"
- "তানি আজ যে আমরা এখানে এসেছি সেটা কেউ জানে না তো?"
- "কে জানবে আবার!"
- "না না, মানে এখানকার কথা কাউকে বলবি না। কারণ এই উপাসনা অত্যন্ত গোপনে করতে হয়। জানাজানি হয়ে গেলে satan আস্তে আস্তে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে নেবে।"
- "ঠিক আছে বলবো না।"

ওরা আস্তে আস্তে আউট হাউসটার দিকে এগোতে থাকে।
বিকেলের আলো কমে আসছে।
পড়ন্ত আলোর কিছু ছটা এসে পড়েছে সামনের বিশাল নেড়া গাছটার উপর। কোনো পাতা নেই গাছটার, মৃত ধূসর ডালপালাগুলো নিয়ে কিস্তৃত কিমাকার একটা দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে আছে যেন।
গাছটা ছাড়িয়ে কিছুটা গেলেই আউট হাউসের বারান্দা।
আগাছার ঝোপঝাড় পেরিয়ে ওরা বারান্দায় গিয়ে উঠলো।
মেঝেতে কয়েক পরত ধুলো।
রুদ্র দরজার নব ঘুরিয়ে একটা ঠেলা মারলো।
একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ করে দরজাটা খুলে গেল।
ভিতরটা ভালো দেখা যাচ্ছে না
পকেট থেকে দেশলাই আর মোমবাতি বার করলো রুদ্র।
তানির প্রচণ্ড ভয় করছে। এর আগে এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি ওর।
মোমবাতি জেলে রুদ্র আর তানি দরজার ভিতরে ঢুকলো।

রুদ্রের জ্বালানো মোমবাতির আলোয় তানি দেখতে পায় যে অধিকাংশ ঘরটাই ফাঁকা। বেশ বড় আর উঁচু ঘরটা। দরজা খুলে ঢুকেই একটা ছোট হল ঘর ও সেটায় প্রবেশ করলে ঘরের পিছনের দিকে দেওয়াল ঘেঁষে একটা ঘর ও ঘরের সামনের দিকে একটা রান্নাঘর। ওপর প্রান্তে ঢুকেই বাঁ দিকে একটা বড় বাথরুম। চারিদিকে ভাল করে নজর ফিরিয়ে নেয় তানি। দেওয়ালগুলো খুব একটা জরাজীর্ণ বলে মনে হয়না, বাইরে থেকে দেখে যেমন লাগছিল সেই তুলনায় ঘরের ভিতর ঢুকে যথেষ্ট পরিষ্কার বলেই মনে হচ্ছে। আসবাব বলতে ঘরের ভিতর কিছুই নেই, শুধু একটা তিন থেকে চার জন বসতে পারে এমন একটা বড় লম্বা সোফা এবং সোফা লাগোয়া একটা টেবিল।

তানি কখনো এমন জায়গায় এমন পরিত্যক্ত বাড়িতে আসেনি, তার ক্ষেত্রে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তার যেন ভয় লাগলো না মোটেই, রুদ্রর সাথে থাকলে সে যেন অনেক বেশি সাহসী হয়ে ওঠে, সব রকম পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। সে মনে মনে ভাবতে থাকে যে রুদ্র তাকে এই জায়গাটার ব্যাপারে আগে কেন বলেনি, বললে হয়তো এতদিনে রুদ্রকে সে মন ভরে আদর করে ফেলতে পারত, হয়তো তাহলে কোন ব্যবধান থাকতো না তাদের শরীর আর আত্মার মধ্যে। যাইহোক, দেবীই হল না হয়, তাতে কী? এখন তো অগাধ সুযোগ আছে। এখন তানি ও রুদ্রকে দেখে ফেলার কোন ভয় নেই। তারা একে অপরের মধ্যে অনায়াসেই লুটিয়ে দিতে পারে।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

তানি এতগুলো কথা ভেবে রুদ্রর হাতটা চেপে ধরে তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয়, তাকায় সোজা রুদ্রর চোখের দিকে। রুদ্র একটাবার নজর মিলিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। তানি রুদ্রর মুখ দু'হাতে ধরে তুলে আবার চোখে চোখ রাখে। রুদ্র নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে। যেন রুদ্রর মধ্যে কোন যুদ্ধ চলছে যেটা সে নিজের সাথেই লড়ছে।

তানি বুঝতে পারে রুদ্রর বিচলিত মনের হাল; তানি বলে ওঠে, “নিজেকে আটকাস না আর। কর তোর যা করার আছে। দেখা আমায় কি দেখাবি। আমি জানি সেই খাতা দেওয়ার মত এইটাও নিছক একটা বাহানা।”

রুদ্র কথা বলেনা কিছুক্ষণ, কোন চিন্তায় যেন হারিয়ে যায়। তারপর হঠাৎই রুদ্রর মধ্যে খুঁজতে থাকা সেই প্রাণবন্ত মানুষটাকে যেন খুঁজে পায় তানি। রুদ্র একবার চোখটা নিচে নামিয়েই তুলে নেয় আবার তানির চোখের দিকে। চেয়ে দেখে তানি, সেই চোখে যেন পূর্বের ক্লান্তির কোন লেশমাত্র নেই, আছে জ্বলতে থাকা অদম্য কোন এক ইচ্ছে। যেন এক দীর্ঘ ঘুমের পর আবার জেগে উঠেছে নিজের সর্ব শক্তির সাথে। তানি জড়িয়ে ধরে রুদ্রকে, রুদ্রও দ্বিগুণ চাপে জড়িয়ে ধরে তাকে। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে থাকার পর রুদ্র তানির সুন্দর মুখখানা নিজের দু হাতের মধ্যে ধরে মনোনিবেশ করে পালকের মত পাতলা কোমল গুঁঠ যুগলের মধ্যে, তৃপ্তিতে চোখ জুড়িয়ে আসে তানির। এইটাই তো সে চাইছিল, চাইছিল সেই আগের জীবনশক্তিতে ভরপুর রুদ্রকে জাগিয়ে তুলতে, তাহলে আজ সে পেরেছে। রুদ্রের গুঁজে পরা গোল্ফিটা এক টানে তুলে ফেলে তার বেল্টের ফাঁস থেকে, অনুভব করে রুদ্রর হাত তার নিতম্বের কাছে পৌঁছে গেছে। শরীরে এক বিদ্যুৎ অনুভব করে তানি। রুদ্রর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে এসে রেখে দেয় নিজের বুকের উপর, রুদ্র যেন চমকে যায় খানিকক্ষণের জন্য। পরমুহূর্তেই আরও বেশি দামালপনার সাথে শারীরিক মাদকতার স্বাদ উপভোগ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে তারা গিয়ে পরে সোফার উপর, ক্রমেই একে অপরকে নির্বস্ত্র করে দেয় তারা। এতটা তাড়াতাড়ি হয়তো তানি আশা করেনি, কিন্তু তাও সে কোন কিছুতেই বাধা দেয়না।

এইসবের কোন অভিজ্ঞতা তানির কোন দিনই ছিলনা, তাই যতই তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে ততই তানির মনের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হতে থাকে। কৌতুহল উবে গিয়ে যেন একটা ভয় চেপে বসে তানির মধ্যে। তারপর আসে সেই মুহূর্ত যেখানে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা তার পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, তানি ভেবেছিল যে রুদ্র হয়ত বুঝবে যে এইটা তানির প্রথমবার, তাই হয়তো সে একটু যত্ন সহকারে বিষয়টাকে গুরুত্ব দেবে। কিন্তু কোথায় যত্ন, কোথায় আদর! যেটাকে একটু আগে অবধি জীবনের উচ্ছ্বাস, উপচে পরা প্রণোচ্ছলতা বলে মনে হচ্ছিল সেইটাই এখন নরকের কোন পাষাণের অনেক দিন পর মুক্ত হয়ে তার স্বাধীনতা ভোগের কায়দা বলে মনে হচ্ছে। তানি চিৎকার করে ওঠে। বলে, “রুদ্র আমার লাগছে, আসতে রুদ্র, আসতে।” কিন্তু কে কার কথা শোনে। রুদ্র চালিয়ে গেল তার অমানুষিক যৌন সঙ্গম, এক সময় থেমে যায় রুদ্র। ততক্ষণে তানির মধ্যে আর শক্তি বাকি নেই, একটা পুতুলের মত পড়ে আছে শুধু দু হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে, যাতে রুদ্র নিজের দামালপনা শেষ করে উঠতে পারে।

কিন্তু তার ধারণার অনেক আগেই থেমে গেল রুদ্র, তাই তানি অবাক হয়ে চোখ মেলে চেয়ে দেখে। রুদ্রকে দেখে তার যেন পিলে চমকে যায়। রুদ্রকে দেখায় ঠিক একটা শয়তানের মত, যেন মনুষ্যত্বের কোন ছাপ নেই তাতে। তানি দেখে রুদ্র পাশে টেবিলে রাখা একটা ব্যাগ থেকে একটা সাদা কাপড় বের করল, করে তানির যৌনাঙ্গ থেকে চুইয়ে পরা রক্ত মুছে নিলো সেই কাপড়টায়। দেখতে দেখতে সাদা কাপড়টা লাল হয়ে উঠল। রুদ্রকে দেখে মনে হল যে তার এখন যৌন মিলন সম্পূর্ণ হয়নি, তাও সে কিন্তু আর তা চালিয়ে গেলনা। সাদা কাপড়টাকে রক্তে ভিজিয়ে সে উঠে পরে, নিজের জামাকাপড় পরে নেয় সে। যেন সেইটাই উদ্দেশ্য ছিল তার। তানি সেই সোফাতেই ব্যথায় কঁকরে পড়ে থাকে ও আধখোলা চোখে দেখতে থাকে যে রুদ্র মেঝের উপরে রক্তে ভেজা কাপড়টা দিয়ে কি সব যেন আঁকছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই রুদ্র যেন সমস্ত প্রাণশক্তি শেষে নিয়েছে তানির মধ্যে থেকে, আধখোলা চোখটা জোর করে খুলে রাখার শক্তিও হারিয়ে ফেলে তানি।

অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ার আগে রুদ্রর অস্ফুট কণ্ঠ কানে আসে, বিড়বিড় করে প্রলাপ বকার মত বকে চলেছে রুদ্র,
“প্রসাদ গ্রহন করও প্রভু, প্রসাদ গ্রহন করো.....”

জ্ঞান হারায় তানি, কিচ্ছু আর মনে নেই তারপর।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলো জানা নেই, তবে যখন জ্ঞান ফিরলো তখন বৈকালিক রোদ্দুর তার শেষ লালিমা নিয়ে অস্তাচলের পথে।

সে কি!! বাড়িতে যে চিন্তা করবে! অনেকটা দেৱী হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করে তানি। আর তখনই টের পায় দুর্বলতা।

শরীর থেকে অনেকটা রক্ত ক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া প্রথম মিলনের ধকল, সাথে এমন মানসিক পরিস্থিতি, শরীরের ওপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। তবে এতটা দুর্বল করে দেবে, ভাবতে পারে নি।

আশপাশ দেখার চেষ্টা করে তানি। ‘রুদ্র.... রুদ্র কোথায়?’ নজরে পড়ে না। খানিকক্ষন আশপাশে নজর বোলায় তানি, নাহ নেই। কোনো রকমে পাশে পড়ে থাকা পোষাকটা গলিয়ে শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে দরজার কাছে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু দরজার কাছে এসেই টের পায় বিপদটা। এ কি! দরজাটা যে বাইরে থেকে বন্ধ! জোড়ে আঘাত করে দরজায়, অত ভারী দরজার পাল্লায় খুব একটা প্রতিফলন ঘটাতে পারে না শব্দের। আশপাশে ঘুরে দু’একটা ঘর নজরে পরলেও সবকটারই দরজা বন্ধ। চিৎকার করে ওঠে তানি। দুর্বল শরীরের কণ্ঠ মোটা প্রাচীর ভেদ করে বহির্জগতে কারুর কানে পৌঁছানো সম্ভব নয় বুঝে এক সময় হাল ছেড়ে দেয়। গলাটা শুকিয়ে আসছে, ব্যাগ হাতড়ে জলের বোতল বার করে গলাটা ভিজিয়ে নেয় তানি, এটুকুই সম্বল। হঠাৎ মনে পড়ে, তাই তো, সে যখন বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলো তখন তো সন্ধ্যা ছিলো। তাহলে? টানা একদিন এই বাড়িতে পরে? ওদিকে না জানি এতক্ষনে কি হুলস্থুল লেগে গেছে।

সত্যিই হুলস্থুল লেগেছে বটে তানির বাড়িতে। একটা সদ্য যৌবনা মেয়ে সন্ধ্যাবেলায় বেড়িয়ে রীতিমতো উধাও। পড়তে যাওয়ার কথা ছিলো, ফোন করে জানা গেলো সেখানেও যায় নি। বন্ধু বান্ধবী কেউ জানেও না। বাধ্য হয়ে থানায় জানায় দীপেন্দুবাবু। থানার বড়বাবুর সাথে ভালো সম্পর্ক থাকায় তদন্তও শুরু হয় পুরোদমে। বড়বাবু মানস অধিকারী তদন্তের শুরুটাই করলেন সহপাঠীদের জেরা করার মধ্যে দিয়ে। ব্যাপারটা খানিক জটিল। আজকালকার বাচ্চাদের জেরা করা খুব চাপের। একটু এদিক থেকে ওদিক হয়ে গেলেই জবাবদিহি করতে হবে সর্বত্র। তাছাড়া এই টেকস্যাভি জমানার বাচ্চা, সব এক একটা অবতার।

যাই হোক, প্রথম জিজ্ঞাসাবাদে বেশ হতাশই হতে হলো। আজকালকার বাচ্চারা নিজেদের নিয়েই একটা জগৎ করে রাখে, তার বাইরে অন্যদের নিয়ে ভাবার সময় কই। তবে খানিক সুন্দরী আর অহংকারী হওয়ায় ছাত্রীদের থেকে ক্লাসের ছাত্ররা বেশি গুরুত্ব দিতো তানিকে, এটা বোঝা গেলো। অনেকেই তানির জন্য বেশ পাগল। তাদের মধ্যেই একজনের সাথে কথা বলে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেলো। তানি নাকি ইদানীং একটা নতুন ছেলের সাথে ঘোরাফেরা করতো। আরো কয়েকজন অবশ্য বললো ছেলেটার কথা। ছেলেটা স্কুলে নতুন, সেভাবে ওকে কেউ চেনে না। স্কুল রেজিস্টার থেকে ছেলেটার ঠিকানা নিয়ে সেখানে গিয়ে খোঁজ মেলেনি ছেলেটার। স্কেচ আর্টিস্ট ডেকে ছেলেটার স্কেচ করানো হলো। আশেপাশে ঘুরিয়ে ফায়দা হলো না খুব একটা। শুধু তানির সাথে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত, আর দু’জনে এক কোচিং-এ পড়তে যেত এই বাদে তেমন কেউ কিছু বলতে পারলো না। তানির বাড়ির থেকে কেউ অবশ্য এই জাতীয় কাজে লাগতে পারে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে নি। তবে তানি নিখোঁজ হওয়ার সাথে এই রুদ্রর একটা যোগাযোগ যে আছে এই ব্যাপারে এখন মোটামুটি নিশ্চিত। রুদ্রর একটা ফটো সার্কুলেট করা হয়েছে আশপাশের থানাগুলোতে। গত ২৪ ঘন্টায় প্রোগ্রেস বলতে এটুকুই।

ডিউটি থেকে ফিরে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিতেই একটু তন্দ্রা মত এসেছিলো, হঠাৎ ঘুম ভাঙলো ফোনের আওয়াজে, শ্যামপুর থানা থেকে, বছর দেড়েক আগে এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিলো। একটা মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ভুলিয়ে শয়তান সাধনার নামে এক পোড়োবাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রথমে ধর্ষণ করে উধাও হয়ে যায়। চারদিন বাদে এক পোড়ো বাড়ি থেকে মেয়েটির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তবে ছেলেটার ট্রেস পাওয়া যায় নি।

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

লাফিয়ে কোনো মতে গাড়িতে ওঠেন মানস। এখুনি খোঁজ করতে হবে আশেপাশে, এই অঞ্চলে পোড়োবাড়ি মাত্র দুটো আছে। দুটোতেই তন্ন তন্ন করে কিছুই পাওয়া গেলো না। তল্লাসী শেষ হতে হতে ভোরের আলো ফুটেছে। সবে বেরতে যাবেন হঠাৎই নজরে পড়লো দূরে একটা আউট হাউস মত কিছু একটা দেখা যাচ্ছে, জঙ্গলে ঢাকা। অন্ধকারে এতক্ষন খেয়াল করেন নি। তালা ভেঙ্গে ঢুকেই অবাক হতে হলো। বাইরে থেকে যতটা অপরিচ্ছন্ন ভেতরটা ততটাই পরিষ্কার, যেন এখানে নিয়মিত কারো যাতায়াত আছে। লাগোয়া দু-তিনটে ঘরের তালা ভাঙতেই উদ্ধার হলো তিনি। গায়ে তার প্রবল জ্বর, রক্তাক্ত শরীর। কিন্তু অনেক খুঁজেও অপরাধী বা অপরাধের সূত্র, কোনটাই পাওয়া গেল না।

তানিকে মেডিক্যাল টিমের হাতে তুলে দিয়ে ইনস্পেক্টর মানস সুখবরটা জানালেন দীপ্তেন্দুবাবুকে। খানিকক্ষণের মধ্যেই তিনিও এসে উপস্থিত হলেন। চোখ ভেঙে তার তখন কৃতজ্ঞতার জল, “কিভাবে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো, সে ভাষা আমার জানা নেই।”

আশ্বস্ত করলেন মানস। “তার দরকার নেই। মেয়েটার ঠিকঠাক চিকিৎসা করান। তবে তদন্তের প্রয়োজনে পরে ডাকতে হতে পারে তানিকে।”

বিদায় নেন দীপ্তেন্দুবাবু।

Investigating টিমকে জায়গাটা ঘেরাও করে নজরে রাখার নির্দেশ দিয়ে জিপে ওঠেন মানস। কতকগুলো প্রশ্ন তাঁর মনকে বিভ্রান্ত করে তুলছে।

একটা ক্লাসিক সিগারেট ধরালেন তিনি।

দেড় বছর আগে ঘটা ধর্ষণের সাথে যদি এই রুদ্রই যুক্ত থাকে তবে ক্লাস ১০-এ পড়ার মতো বিশ্বাসযোগ্য চেহারা সে কিভাবে তৈরি করলো? আগের ঘটনার ক্ষেত্রেও অপরাধীর কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি, কেস ছিল অমীমাংসিত। কিভাবে? কে এই রুদ্র? আদৌ রক্তমাংসের মানুষ তো? এই আউটহাউসের সাথে তাঁর কি যোগাযোগ? তাঁর টার্গেট এই নাবালিকা তানিকেই বা হতে হল কেন?

এরপর বারকতক মানসবাবু তানিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন অবশ্য, তবে আজ বছর চারেক বাদেও ট্রেস করতে পারেন নি রুদ্রকে।

শুধু আজও মাঝে মাঝে খবরের কাগজে নজরে পড়ে “অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের প্রেমে সারা দিয়ে শয়তানের শিকার স্কুল ছাত্রী”।



ছবি - সৌভিক সেনগুপ্ত

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

ক্ষয়াটে জীবন

~ সৌপর্ণ গাঙ্গুলী

চারিদিকে ছেয়ে গেছে কালচে ধোঁয়া,
জীবন তো নয় এটা!
যেন পাটের কারখানা;
অথবা, ফুসফুসে নিকোটিনের ছোঁয়া।
না সাহিত্য নয়, বাস্তব বলছি.....
রাস্তায় শুয়ে থাকে যারা,
নিষে হাড় জিরজিরে ছানাপোনা;
তাদের নেই উন্নতি, নেই কোন চাওয়া।
অসীমেই মিশে গেছে ধর্ম-কেলেঙ্কারি,
গরীবের কি বা ধর্ম! কি বা জাত!
এদিক থেকে ওদিক হলেই,
কমা নয়, দাঁড়ি!
তবু ভরসা এটুকুই, ওরা খোয়ায়ানি সম্মান;
কিন্তু.....
সে যা হচ্ছে হোক! ----- সরকার ম্লিয়মাণ।।

প্রথম আলো

~ শুভরাজ দত্ত

নিরঞ্জন আশুতোষ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। যথেষ্ট মেধা থাকা সত্ত্বেও গতকাল ফাইনাল পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না পাওয়ার জন্য শিক্ষক, বাবা- মা, বন্ধু-বান্ধব সকলের বিদ্রূপের শিকার হতে হয়েছে তাকে। আজকাল তেমনভাবে যেন আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে হয় না। কি একটা ভাবনা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। সব সময় সে কিছু একটা ভাবতে থাকে। কলেজে সে প্রায় যায় না বললেই চলে, সব সময় নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখে। ছোটবেলার বন্ধু সিদ্ধার্থ এসে দেখা করলেও যেন তার ভালোই লাগে না। কোনো রকমে তাকে কাটিয়ে দিয়েই সে আবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। সিদ্ধার্থ বেরিয়েই যাচ্ছে, ঠিক তখনই নিরঞ্জনের বাবা তাপস চন্দ্র বসু সিদ্ধার্থের নাম ধরে ডাকলেন।

তাপস চন্দ্র বসু (চিন্তিত): "বাবা সিধু, নিরুটার একি হলো বলতো? দিবিই তো সব চলছিল, হঠাৎ করে এ কি যে হল কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তোর কাকিমাতো বুড়ো শিবতলায় হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন। খুব চিন্তা হচ্ছে ছেলেটার জন্য, কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

সিদ্ধার্থ: "আমিও তো কিছুই বুঝতে পারছি না কাকু। মনে হয়, রেজাল্ট খারাপ হওয়ার জন্যই খুব ভেঙে পড়েছে। আপনারা বরং ওকে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসুন, তাহলেই দেখবেন ওর মন ভালো হয়ে যাবে।"

তাপস চন্দ্র বসু: "কতবার বললাম ওকে, ও কোথাও যেতে চায় না। শুধু কি একটা যেন ভাবে সারাদিন। কি হলো বলতো? ভাবছি কোন সাইকিয়াটিস্টকে দেখিয়ে নেবো। জানিনা ও কি ভাবে, আর কি চায়?"

মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করেন তিনি।

সিদ্ধার্থ: "আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে কাকু, আমি আজ আসি তাহলে।"

কলেজের ক্লাসমেটের মধ্যে কথা হচ্ছে, এমন সময় সুবীর বললো,

সুবীর: "কি হয়েছে বলতো নিরু? অনেকদিন আসছে না, কি ব্যাপার?"

সিদ্ধার্থ: "বাদ দে তো, আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে, ভালো ছেলে বলে বড় দেমাক। কথাই বলতে চায়না। অত Attitude কিসের?"

সুবীর: "অন্য কোনো সমস্যাও তো হতে পারে। ওতো অনলাইন হয় না প্রায় ১০ দিন। ওকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজও করেছিলাম, দেখলাম seen পর্যন্ত করেনি।"

সিদ্ধার্থ: "ছাড়তো, বাদ দে ওসব। তুই আমাকে notes গুলো দে।"

এদিকে নিরঞ্জনের বাবা-মার চিন্তা বেড়েই চলেছে তাদের ছেলেকে নিয়ে।

তাপস চন্দ্র বসু: "কোথায় গিয়েছিলি?"

নিরঞ্জন: "লাইব্রেরীতে।"

তাপস চন্দ্র বসু: "কেন?"

নিরঞ্জন: "বই নিতে।"

তাপস চন্দ্র বসু: "নিরু, একটু মন দিয়ে পড়াশোনা কর বাবা। আরতো মাত্র দুটো বছর, একবার গ্রাজুয়েশন হয়ে গেলে, তুই যা চাইবি তাই হবে।"

নিরঞ্জন: "তুমি ভেবো না বাবা।"

তাপস চন্দ্র বসু: "তুই সেই যে শিমুলতলা বেড়াতে গিয়ে জ্বর বাধালি, তারপর থেকেই তোর এই অবনতি।"

নিরঞ্জন: "জানিনা বাবা, আমি কি করে ভালো হয়ে উঠলাম, আর কে আমার সেবা করল? তখন তো আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।"

তাপস চন্দ্র বসু: "আচ্ছা বাবা, তোকে কেউ কিছু খাইয়ে তুকতাক করে দেয়নি তো?"

নিরঞ্জন: "উফ বাবা! বিরক্ত করো না তো, আমার খুব খিদে পেয়েছে খেতে দাও।"

তাপস চন্দ্র বসু: "প্রভু, তুমি ওকে দয়া করো বাবা, শ্রীরামকৃষ্ণ।"

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

রাতে ভীষণ মাথার যন্ত্রনা শুরু হয় নিরঞ্জনের। মা গীতাদেবী, তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,

মা: "বাবু তোকে নিয়ে আমাদের খুব চিন্তা হয়। তুই যে সেবারে শিমুলতলা বেড়াতে গিয়ে জ্বরে পড়লি, আর তোর সব বন্ধুরা তোকে একা ফেলে চলে এলো। সত্যি করে বলতো প্রেম ভালোবাসা করছিস? সেকি তোকে কষ্ট দিয়েছে?"

নিরঞ্জন: "উফ মা, বিশ্বাস করো সেরকম কিছু নয়। আমি কিছুই জানিনা। যে আমায় সে রাতে সেবা করলো, তাকে আমি চোখেই দেখিনি। কিন্তু তার স্পর্শ অনুভব করেছি। যেন শরীর মন জুড়িয়ে গেল। সে যে কি পরম অনুভূতি, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তারপর থেকেই আমি সুস্থ হতে শুরু করলাম।"

মা: "এটা কি বই?"

নিরঞ্জন: "কঠোপনিষদ।"

মা: "এসব না পড়ে, পড়ার বইগুলো তো একটু পড়তে পারিস বাবু। দুমাস পরে তোদের ফাইনাল পরীক্ষা, একটু মন দে পড়াশোনায়।"

নিরঞ্জন: "দেবো দেবো, তুমি কিছু ভেবোনা। এখন তুমি এসো।"

মা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, দরজা বন্ধ করে দিয়ে বইয়ের পাতাটা উল্টে পাল্টে দেখে নিরঞ্জন। এত কঠিন শব্দ যে, তার মানে ও বুঝতেই পারেনা। আরো মন খারাপ হয়ে যায় তার। বইটা বন্ধ করে বুক সেলফে রাখতে যাবে, সেই সময় বইটা থেকে একটা লিফলেট পড়ে যায় মেঝেতে। লিফলেটটা তুলে দেখে নিরঞ্জন। তাতে লেখা আছে, আগামী ২৩ শে ফেব্রুয়ারিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান সংঘটিত হচ্ছে এবং সেই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ঠিকানাও দেওয়া রয়েছে। দেখে নিয়ে জল খায় নিরঞ্জন, আর ভাবতে থাকে যাবে কিনা। যে প্রশ্নগুলো তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সে কি সেগুলোর উত্তর পাবে, নাকি সে এইভাবে দিকভ্রান্ত হতে থাকবে? সে কি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে?

উৎসবের দিন এসে উপস্থিত হয় এবং সে উপযুক্ত স্থানে হাজির হয়। একটা সাধারণ একতলা ঘর, সেখানে মানুষজন হাতজোড় করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভজন করছে।

একজন গেরুয়া বস্ত্র পরা সন্ন্যাসী হাতে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে আরতি করছেন। নিরঞ্জন একপাশে বসে হাত জোড় করল। তার মনে যেন খুশির সঞ্চার হতে থাকলো। যেন মনে হতে লাগলো, এই ভজন তার খুব পরিচিত। মনটা যেন আরাম পাচ্ছে আরতি দেখে। সাথে ঘরে ধূপ ধূনার গন্ধে, এমন আধ্যাত্মিক পরিবেশে তার মনে হতে লাগলো এ যেন তার কত পরিচিত স্থান। আরতি শেষ হলে সবার মতো ফলপ্রসাদ নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালো নিরঞ্জন।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন,

সন্ন্যাসী: "কি নাম তোর? কোথা থেকে আসছিস?"

নিরঞ্জন: "আজ্ঞে, গড়িয়া থেকে।"

সন্ন্যাসী: "বেশ বেশ।"

নিরঞ্জন তখনই একটা প্রণাম সেরে নিল।

নিরঞ্জন: "মহারাজ, আমি আশুতোষ কলেজের ছাত্র। কিছু বুঝতে পারছি না, খালি কি যেন ভাবছি? কি হচ্ছে? পড়াশোনায় মন বসছে না..."

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

সন্ন্যাসী: "তোমার মনে তো দেখছি অনেক প্রশ্ন। এই নে, এই বইতে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পাবি। আর দেরি করিস না, বাড়ি ফিরে যা। রাত হয়ে গেছে। আবার আসিস কেমন।"

বাসে করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে নিরঞ্জনের মনে হচ্ছিল, যেন ওখানে আরও কিছুক্ষণ থাকলেই ভালো হতো। আর কি বা করবে সে? বাড়ি তো ফিরতেই হবে। দেরি করলে ওদিকে মা-বাবা চিন্তা করবে। অবশেষে বাড়ি ফিরে, খাওয়া সেরে বিছানায় বসে সন্ন্যাসীর দেওয়া বইটা দেখে নিরঞ্জন। বইটির নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম খণ্ড'। বইটার এক একটা পাতা পড়তে পড়তে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেরও মনে নেই। ঘুম ভাঙলো সকালে মায়ের ডাকে।

মা: "কিরে কলেজ যাবি না?"

নিরঞ্জন: "হ্যাঁ, যাবো তো।"

মা: "তৈরি হয়ে নে চটপট। ভাত তরকারি সব তৈরি।"

নিরঞ্জনের মনে হল, সেই তো কলেজে ক্লাস করতে ভালো লাগবে না। বাড়িতে থাকলে আবার মা প্রশ্ন করবে। তার চেয়ে বরং কলেজের লাইব্রেরীতে গিয়ে বসে কথামৃতটা মন দিয়ে পড়া যাবে। কাল সবে শ্রীম'র সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম দর্শনের অধ্যায়টা পড়েই আরোও যেন পড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা নিজেই জানে না। যাওয়ার সময় সে মাকে বলল,

নিরঞ্জন: "মা, আমার ফিরতে একটু দেরি হবে, তুমি চিন্তা করো না। রাত নটার মধ্যেই ফিরে আসবো।"

মা : " কোথায় যাবি বাবা?"

নিরঞ্জন: "ওই একটা নোটস নেওয়ার আছে সিধুর বাড়ি থেকে।"

কলেজে গিয়ে প্রথম ক্লাসটা শেষ করেই কাউকে কিছু না বলে লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়তে শুরু করে নিরঞ্জন। তার মনে হতে থাকে তার জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর সত্যিই যেন এই বইটির মধ্যেই রয়েছে। সে সিদ্ধান্ত নেয়, আজ কলেজ থেকে সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে। তারপর সে বাড়ি ফিরবে। সেই মতো যথাসময় উপস্থিত হয় নিরঞ্জন। আরতির পর প্রসাদ খেয়ে আর প্রণাম সেরে, সন্ন্যাসীর কাছে এসে দাঁড়ায় নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন: "মহারাজ, আমার বইটা পড়ে যেন আগের থেকে অনেক হালকা লাগছে। আচ্ছা মনে যে ভাব আমার তৈরি হচ্ছে সেটাকে কি সব সময় ধরে রাখা যায়? আগে রাতে ভালো ঘুম হতো না, কিন্তু গতকাল আমার খুব ভালো ঘুম হয়েছে।"

সন্ন্যাসী: "শুধু বই পড়লে কি হয় রে? তার সাথে সাথে সাধন ভজনও করতে হয়। আর ঠাকুরের সেই কথাটি, শিব জ্ঞানে, জীব সেবা' এটা পালন করতে হবে।"

নিরঞ্জন: "কিভাবে জীব সেবা করবো? বলুন....."

সন্ন্যাসী: "যখন কোন লাজ্জিত-পীড়িত মানুষ তোমার কাছে সাহায্য চাইবে বা তুমি কাউকে সেবা দিবি, তখন মনে রাখবি যে স্বয়ং শিব তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভগবানকে আমরা যেমন যত্ন করে সেবা করি, সেই ভাবে তাকেও ওষুধ, পথ্য এবং দরকারি জিনিস দিয়ে সেবা করতে হবে। আবার অন্য দিক থেকে দেখলে, যে মানুষটি সেবা নিচ্ছে সেও মনে মনে ভাববে যে ভগবান স্বয়ং এসে তার প্রাণ রক্ষা করছেন। একবার ভাবতো, কতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে তোমার?"

নিরঞ্জন: "আমি কাল থেকে.... না না.... আজ এফুনি শুরু করব। আপনি বলে দিন, আমি কিভাবে আর কোথা থেকে শুরু করব?"

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

সন্ন্যাসী: "ঠাকুরের ইচ্ছে হলেই তুই সুযোগ পাবি। এখন বাড়ি যা। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তোর চৈতন্য হোক। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ...."

এরপর কেটে যায় চার মাস। পরীক্ষা শেষ নিরঞ্জনের। মনে যেন তীব্র বৈরাগ্য এসেছে। সে এখন নিজ ভাবে ধ্যান করে। রাস্তায় কোনো অভুক্ত মানুষ দেখলে যেন তার প্রাণ কেঁদে ওঠে, তার যথাসম্ভব সেবা করার চেষ্টা করে। Covid - 19-এর দাপট শুরু হয়, এর মধ্যেই লকডাউনে গোটা দেশ তখন আতঙ্কিত। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেবা কার্য করার সুযোগ আসে নিরঞ্জনের কাছে। মা বাবার কাছ থেকে ছাড়া তখনও পায়নি নিরঞ্জন। এইসব রকম পিছুটানকে উপেক্ষা করে মা-বাবার আপত্তি সত্ত্বেও ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে নিরঞ্জন। মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, কষ্ট দেখে চোখ ফেটে জল আসে তার। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করে সে, এই মহামারী থেকে মানবসমাজকে মুক্তি দেওয়ার জন্য।

এদিকে নিরঞ্জনের বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ছেলের জন্য। একে তো এই মহামারী, এই সময় চাইলেও সেখানে যেতে পারবেনা। তার ওপর বাড়িতে এসে পাড়ার লোকজন শাসিয়ে গেছে যে বাড়িতে কেন পাড়াতেই ঢুকতে দেওয়া হবে না নিরঞ্জনের। সে যেখানে আছে সেখানেই যেন থাকে।

তাপস চন্দ্র বসু: "ঠাকুর, নিরু তো তোমারই সন্তান। তুমি ওকে রক্ষা করো।"

একে সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রম, অনিয়মিত খাওয়া দাওয়ার জের, তার ওপর মহামারীর প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে নিরঞ্জন। বলে দেয়, লকডাউনের সময় বাবা মাকে খবর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ সামান্য শরীর খারাপ, সে কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। জ্বর, সাথে মাথা যন্ত্রণা এবং শ্বাসকষ্ট। সে এখন কোয়ারেন্টিনে রয়েছে। সেবা করার জন্য দুজন লোক ছিল বটে, কিন্তু ভয়ে চম্পট দিয়েছে। একা বিছানায় শুয়ে, তীব্র কষ্টের মধ্যে ছটফট করতে থাকে নিরঞ্জন। কি করবে সে? কিছুই করার নেই। ওষুধ খেয়েছে সে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তাহলে এখানেই কি তার জীবনের শেষ? হঠাৎ দরজায় একটা কড়া নাড়ার শব্দ (একবার, দুবার, তিনবার)। অনেক কষ্টে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে অবাক হয় নিরঞ্জন। সামনে তার মা দাঁড়িয়ে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে তাকে,

নিরঞ্জন: "তুমি! তুমি কিভাবে এখানে এলে? আর বাবাকে বাড়িতে একা রেখে এলে? তুমি এখানে কি করে থাকবে?"

মা(গীতাদেবী): "বাবা, তুই যে কষ্টে আছিস, তাইতো আমি চলে এলাম। আমায় নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। তুই এখন শুয়ে পর দেখি।"

নিরঞ্জন: "আমি শ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছি না ঠিক করে, খুব কষ্ট হচ্ছে। আর তুমি মাস্ক পড়নি কেন? জানো না, মাস্ক এখন মাস্ট।"

মা (গীতাদেবী): "বাবা তুই শুয়ে পড়, আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। চিন্তা কি, আমি তো আছি।"

আজ যেন মায়ের কথায় কোন বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে না নিরঞ্জন। মায়ের হাতের স্পর্শে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ে বুঝতেই পারে না। সকালে ঘুম ভাঙার পর সে দেখতে পায়, তার মাথার সামনে একজন ডাক্তার এবং সেই সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। মাকে দেখছে না তো, কিছুটা বিস্মিত হলো।

নিরঞ্জন: "মহারাজ, আপনি কিভাবে? কোথা থেকে এলেন?"

সন্ন্যাসী: "আমি তো কোয়ারেন্টিনে, camp visit করতে যাচ্ছিলাম। এদিকে কেস খুব বেশি থাকায় আসতে হলো।"

নিরঞ্জন: "আচ্ছা ডাক্তারবাবু এই NGO-র কি কোন নিয়ম কানুন নেই?"

ডাক্তার বাবু: "কেন কি হলো?"

নিরঞ্জন: "আমি কত করে বারণ করলাম আমার বাড়িতে খবর না দিতে, বাবা মা চিন্তা করবে। আপনারা আমার কথা না শুনে মাকে খবর দিলেন। আবার এখানে নিয়েও আসলেন। এবার বলুন তো, বাড়িতে বাবা একা রয়েছে। এইখানে আসার পর মা কোথায় থাকবে, এইটুকু তো ঘর? বাড়িতে ফেরৎ পাঠালেও

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>

সমস্যা, ওখানে গেলেও তো কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। আর মাকে আপনারা এখন কোথায় রেখেছেন, দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমার খুব চিন্তা হচ্ছে, দয়া করে বলুন।"

ডাক্তারবাবু: "Cool down my boy, দেখো নিরঞ্জন তুমি তো ভালো করেই জানো, এটা একটা আশ্রম পরিচালিত NGO। এখানে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। কাজেই কোনো মহিলা এখানে আসতেই পারেন না। তাছাড়া তোমার permission না নিয়ে, আমরা কেনই বা তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবো? সিকিউরিটি সাধারণত পাহারাতেই ছিল। সে তো কাউকেই আসতে দেখেনি। সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে, তুমি চাইলে দেখতে পারো। আমার মনে হয়, তুমি স্বপ্ন দেখেছো। (স্টেথোস্কোপ বুকের উপর বসিয়ে বলে) দেখি, জোরে জোরে শ্বাস নাওতো। Pulse তো দেখছি প্রায় নরমাল। strange! কাল তো দেখলাম অক্সিজেন fall করছিল। এক রাতের মধ্যে এতটা ইমপ্রুভমেন্ট?"

নিরঞ্জন: "কি বলছেন ডাক্তার বাবু, আমি নিজের মাকে চিনতে পারবো না? সত্যি করে বলুন তো, মা কোথায়? আমার কিন্তু খুব চিন্তা হচ্ছে, নতুন জায়গা মা কিচ্ছু চেনেন না।"

ডাক্তার বাবু: "তোমার মনে হয় এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আমি তোমার সাথে ইয়ার্কি মশকরা করছি? কাল এখানে কেউই আসেননি। ও আচ্ছা.. তুমি যে বলছো, তাহলে ওনার জুতো জোড়া কোথায়? আমরা তো সকালে প্রথম গেট খুলে এখানে আসলাম। এখান থেকে তো কারোর বেরনোর কোন প্রশ্নই নেই। থানায় না জানিয়ে আমরা এখন কাউকেই এখান থেকে যেতে দিতে পারি না। নিয়মটা আশা করি তুমি নিশ্চয়ই জানো। তুমি তো নিজেই সেই সব মেনে কাজ করো।"

নিরঞ্জন: "কিন্তু আমি যে তার হাতের স্পর্শ পেয়েছি। সেই দিব্য অনুভূতি, সেই কথা, সবই কি মিথ্যে?"

সন্ধ্যাসী: "ওরে নিরঞ্জন, এখনো কিছু বুঝলি না? স্বয়ং শ্রীশ্রীমা তোকে রক্ষা করেছেন। এই সবই তাঁর কথা। তুই ভাগ্যবান যে তুই তাঁর কৃপা পেয়েছিস।"

নিরঞ্জন তৎক্ষণাৎ বাড়িতে ফোন করে বাবাকে। জানতে পারে যে বাড়িতে সবাই ভালো আছে। আর কোভিডের বাড়বাড়ন্তের জন্য তারা বাড়িতে গৃহবন্দী। অনেক ইচ্ছে হলেও বাইরে বেরোনোর কোন রাস্তা নেই তাদের। দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা নামতে থাকে নিরঞ্জনের।

নিরঞ্জন: "মাগো, তোমার এত দয়া! আমায় তুমি কৃপা করলে, অথচ তোমায় চিনতে পারলাম না?"

(দেওয়ালে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ফটোর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে নিরঞ্জন)

সন্ধ্যাসী: "শ্রীশ্রীমায়ের লীলা স্বামীজি স্বয়ং বুঝতে পারেননি, তুই আর আমি কি করে বুঝবো? তিনি যে জগন্মাতা, আমরা সবাই তাঁর সন্তান। সারা জীবন তপস্যা করলেও অনেকে যা পায় না, তুই আজ তাই পেয়ে গেলি।"

নিরঞ্জন: "আমি শিব জ্ঞানে জীব সেবা করতে চাই মহারাজ। আপনি আমায় সন্ধ্যাস মতে দীক্ষা দিন। আমি বুঝে গেছি আমার পথ কোনটা? আশাকরি, বাবা-মা রাজি হয়ে যাবেন বুঝিয়ে বললে।"

॥সমাপ্ত॥

গ্রন্থস্বত্ব - টিম গল্পের তরী

<https://www.youtube.com/c/GalperTori>